বিষয়ঃ হাইড্রোলজি

প্রবিধানঃ ২০২২

পর্বঃ ৪র্থ

বিভাগঃ পুবকৌশল

ক্লাস শুরুঃ ২০/০৮/২৩

বিষয় কোডঃ ২৬৪৪৬

T	P	C
2	3	3

শিক্ষকঃ রত্নজিৎ পিয়াল

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিলেট।

হাইড্রোলজি সম্পর্কিত কিছু কথাঃ

হাইড্রোলজি হলো পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহে জলের গতিবিধি, বণ্টন ও পরিচালনার বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে জলচক্র, পানি সম্পদ এবং পরিবেশগত জলাবদ্ধতা স্থায়িত্বও অন্তর্ভুক্ত। হাইড্রোলজি সংক্রান্ত গবেষণারত ব্যক্তিকে **"জলবিজ্ঞানী"** বলা হয়, তিনি পুরকৌশল এবং পরিবেশ প্রকৌশল, ভূবিজ্ঞান বা পরিবেশ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহার করে তারা উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জল ব্যবস্থাপনার মতো জলের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করে থাকে। জলবিজ্ঞান বিষয়টি ভূপৃষ্ঠস্থ জলবিজ্ঞান, ভূগর্ভস্থ জলবিজ্ঞান (জলভূতত্ত্ব) এবং সামুদ্রিক জলবিজ্ঞানে বিভক্ত। জলবিজ্ঞানের বলয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আবহও-জলবিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠেস্থ জলবিজ্ঞান, ভূতাত্ত্বিক জলবিজ্ঞান, জল নিষ্কাশন অববাহিকা ব্যবস্থাপনা এবং পানির গুণমান, যেখানে পানি মূল ভূমিকা পালন করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজিক্যাল চিত্র★

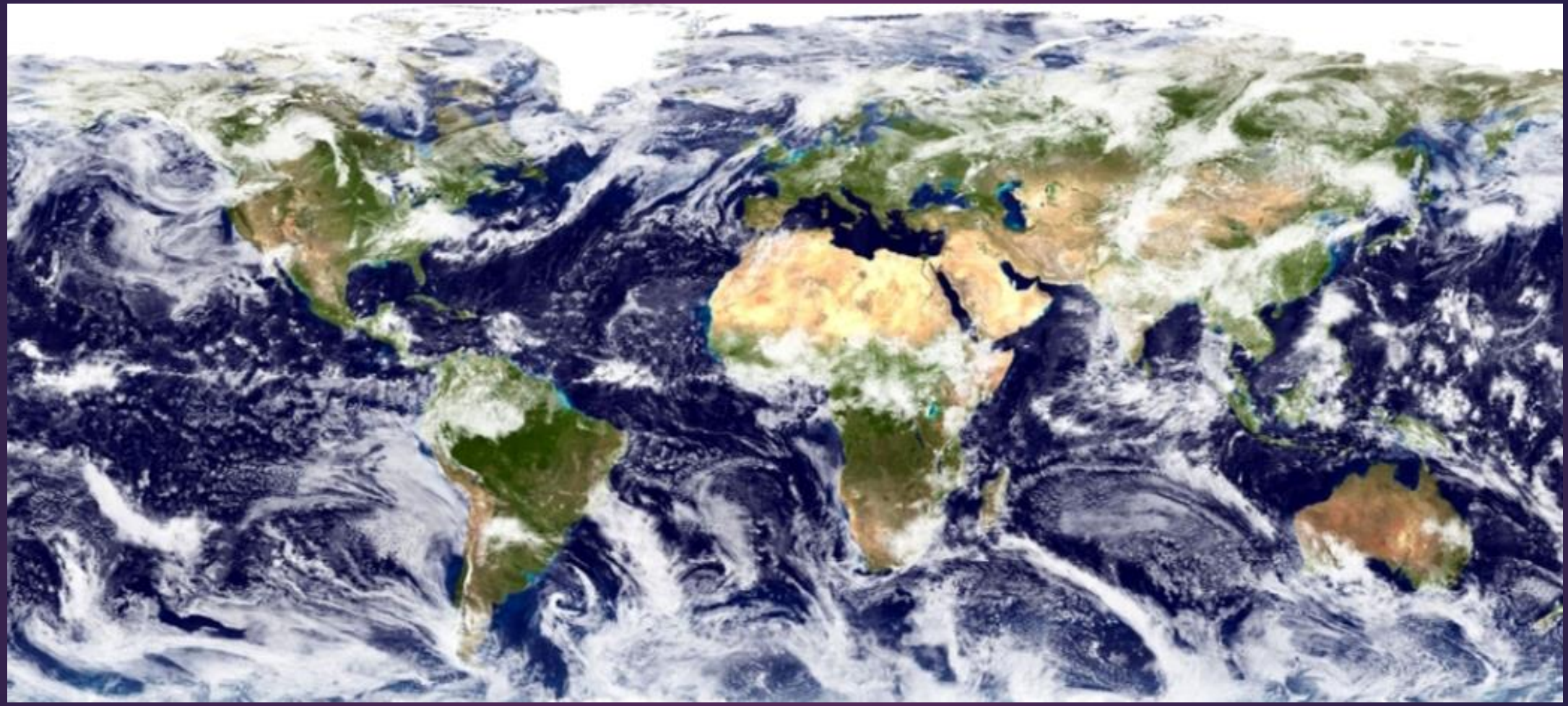

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১
ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রোলজির ধারণা

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. হাইড্রোলজির সংজ্ঞা

২. হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল

৩. হাইড্রোলজির বৈশিষ্ট্য

৪. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হাইড্রোলজির প্রয়োগ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজির সংজ্ঞা★

হাইড্রোলজি হলো পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহে জলের গতিবিধি, বণ্টন ও পরিচালনার বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে জলচক্র, পানি সম্পদ এবং পরিবেশগত জলাবদ্ধতা স্থায়িত্বও অন্তর্ভুক্ত। হাইড্রোলজি সংক্রান্ত গবেষণারত ব্যক্তিকে **"জলবিজ্ঞানী"** বলা হয়, তিনি পুরকৌশল এবং পরিবেশ প্রকৌশল, ভূবিজ্ঞান বা পরিবেশ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল★

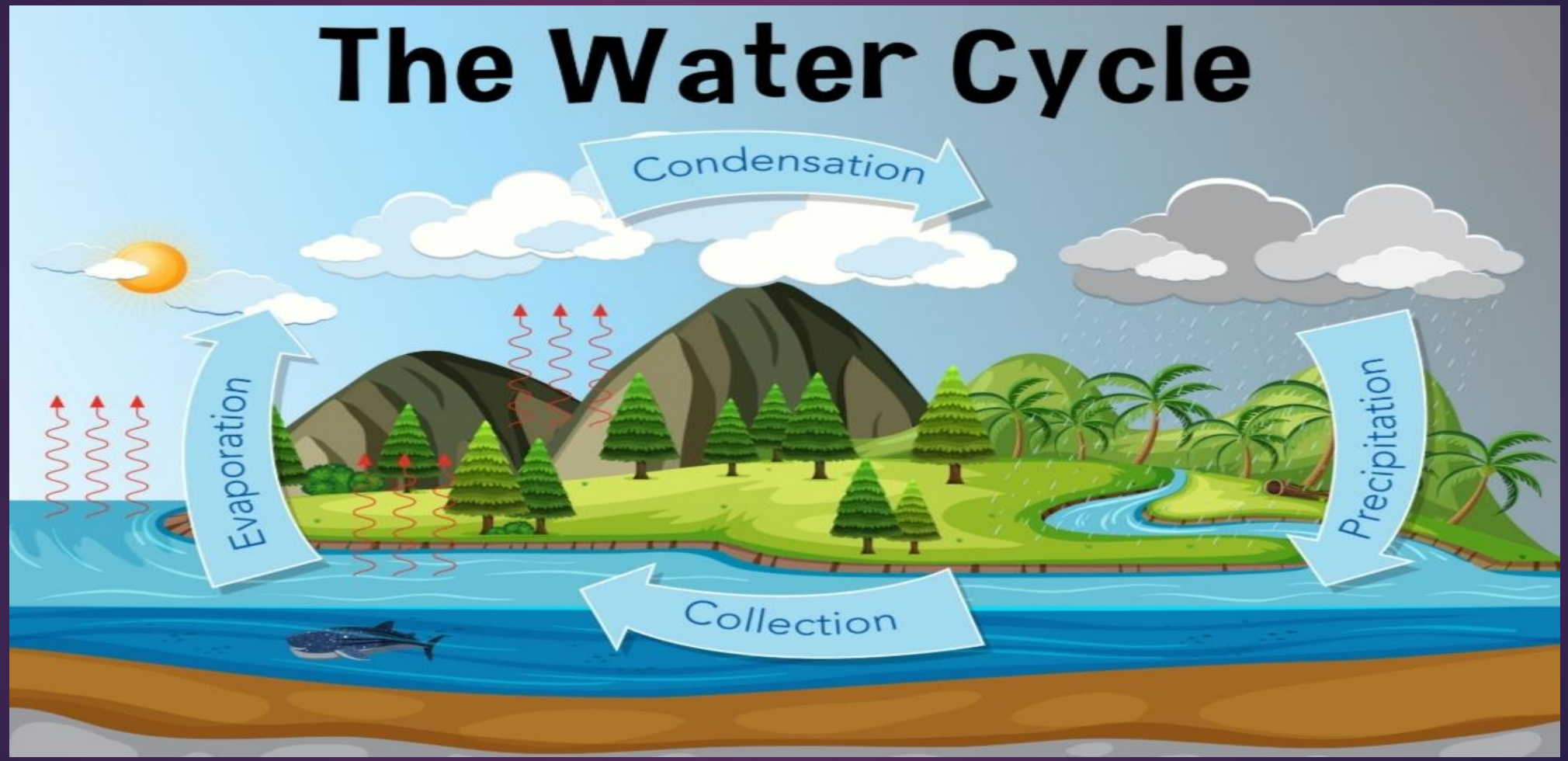

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল★

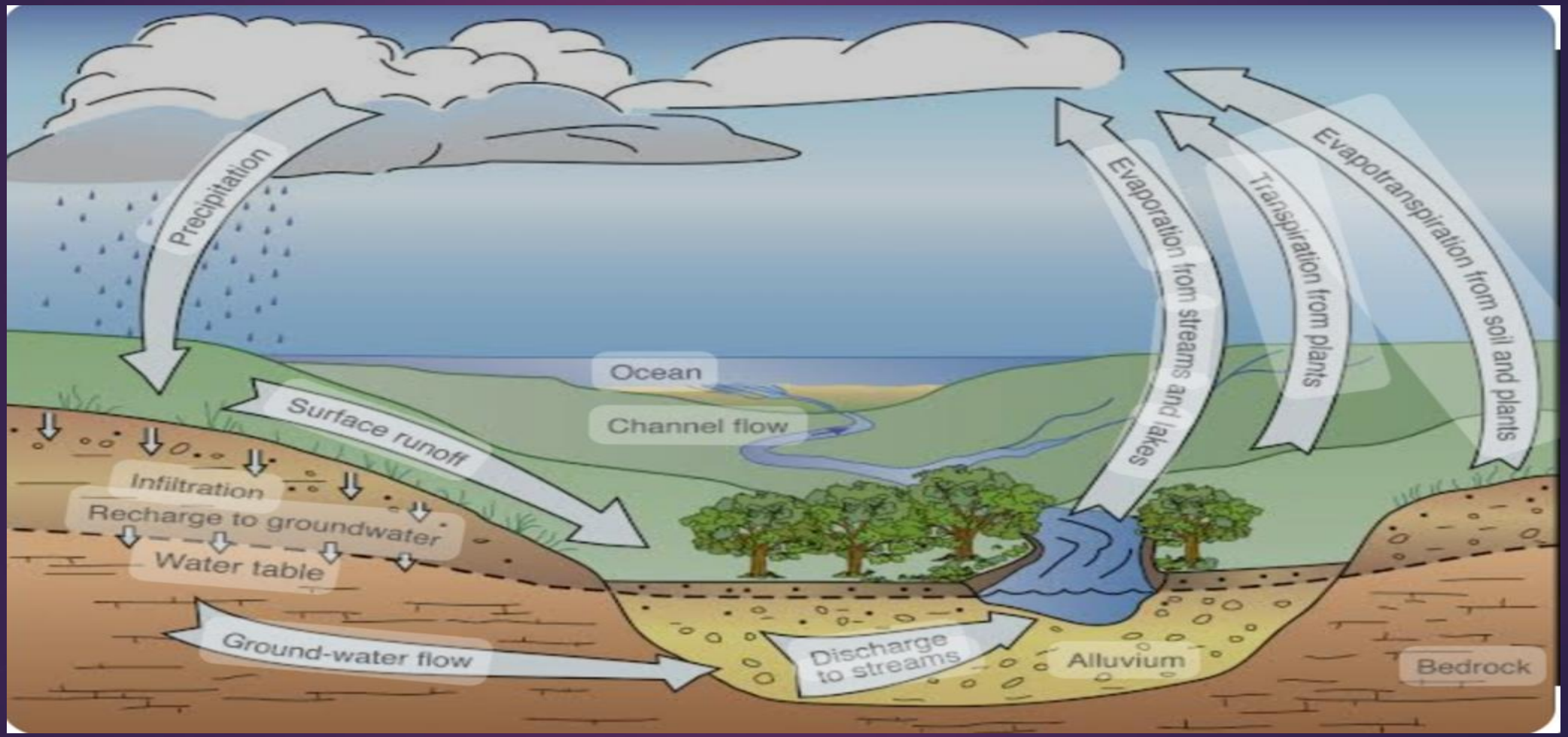

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল★

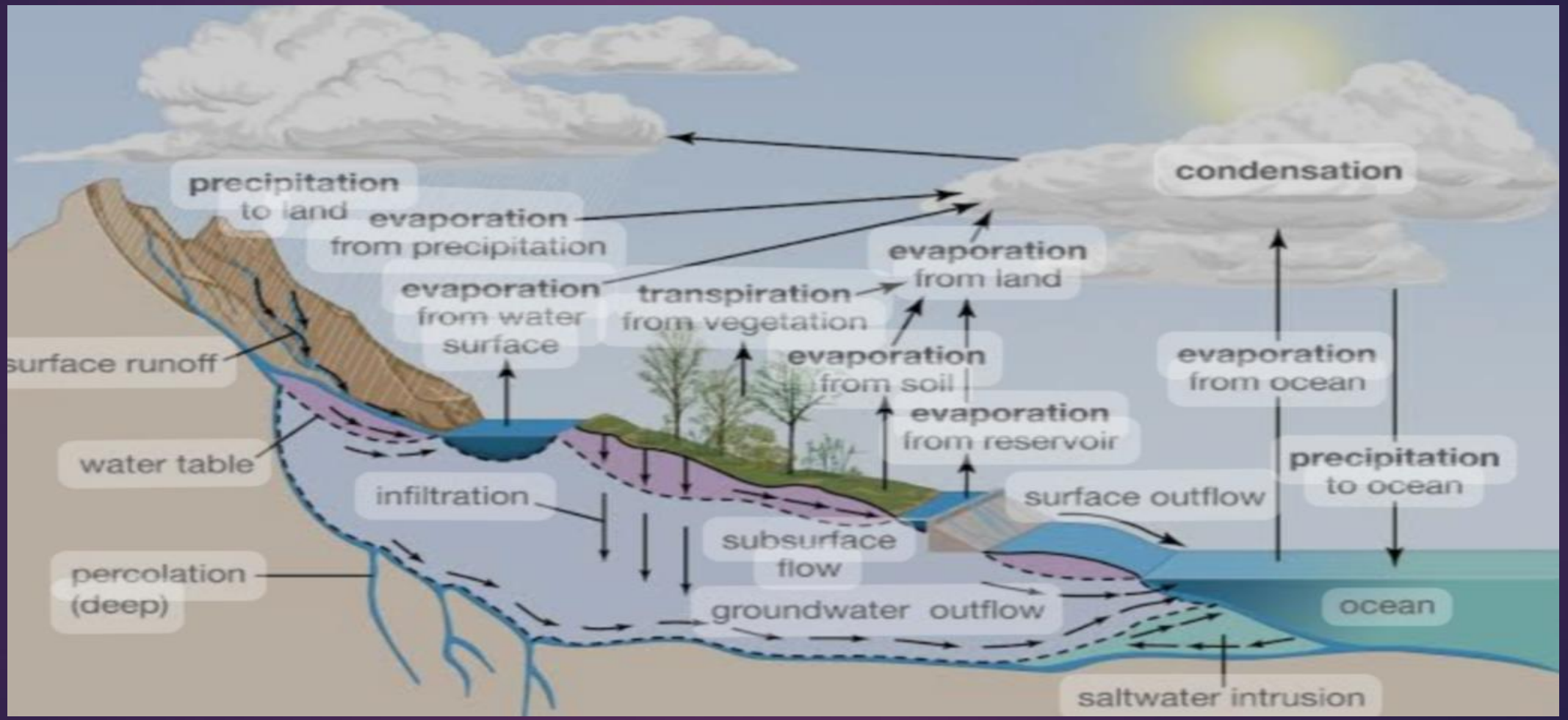

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজির বৈশিষ্ট্য★

১. বৃষ্টিপাত
২. বাষ্পীভবণ ও প্রস্বেদন
৩. রানঅফ
৪. অনুপ্রবেশ
৫. ভূগর্ভস্থ পানি
৬. নদী ও স্রোতের প্রবাহ
৭. হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং
৮. হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ
৯. পানির গুণগত মান
১০. বন্যা ও খরা ব্যস্থাপনা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হাইড্রোলজির প্রয়োগ★

১. হাইড্রোলজি স্ট্রাকচার ডিজাইন
২. সেচ
৩. মিউনিসিপ্যাল ও শিল্পকারখানায় পানি সরবরাহ
৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৫. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন
৬. নৌ চলাচল

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-২
হাইড্রোলজি সাইকেল

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. পানিচক্রের কার্যাবলি
২. হাইড্রোলজিক ডাটা ও পরিমাপ
৩. বারিচক্রের সচিত্র বর্ণনা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★পানিচক্রের কার্যাবলি★

(ক) বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন;

(খ) ঘনীভবন (মেঘমালায় বা পানিকণায় রূপায়ণ);

(গ) বিভিন্নরূপে ভূপৃষ্ঠে পানির পতন (বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, কুয়াশা ইত্যাদি);

(ঘ) ভূত্বকের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া এবং ভূপৃষ্ঠস্থ উৎসে সঞ্চিত হওয়া;

(ঙ) মৃত্তিকায় পানি শোষণ এবং পানি ধারণকারী স্তরে সঞ্চিত হওয়া;

(চ) ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানিপ্রবাহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎসে পানি জমা হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোলজিক ডাটা ও পরিমাপ★

হাইড্রোলজিক ডাটা (Hydrologic data) ঃ বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পানি ব্যবস্থাপনার মতো পানিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ ধরনের তথ্য হাইড্রোলজিক ডাটা নামে পরিচিত।

হাইড্রোলজিক পরিমাপ (Hydrologic measurement) ঃ হাইড্রোলজিক পরিমাপ জলবিদ্যার চক্রে পানির পরিমাণ, প্রবাহ, স্তর, গুণগত মান এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিসহ পরিমাণগতভাবে পানির বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। জলসম্পদ বুঝা ও পরিচালনা, বন্যা ও খরার পূর্বাভাস প্রশমন এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য জলবিদ্যার পরিমাপ অপরিহার্য।

নিম্নে সাধারণ হাইড্রোলজিক পরিমাপ দেয়া হলো—

(ক) নির্গমন পরিমাপ (Discharge measurement) ঃ একটি নদী, স্রোত বা চ্যানেলে যে হারে পানি প্রবাহিত হয়, সাধারণত প্রতি সেকেন্ডে (m^3/s) বা ঘনফুট প্রতি সেকেন্ডে (cfs) পরিমাপ করা হয়। নদীপ্রবাহের ধরন বুঝা, বন্যার পূর্বাভাস এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য নিষ্কাশন পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) পানিস্তর পরিমাপ (Water level measurement) ঃ নদী, হ্রদ, জলাধার বা ভূগর্ভস্থ পানির কূপের পানির উচ্চতা, যা সাধারণত গেজ বা পানিস্তর রেকর্ডার ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। পানিস্তরের পরিমাপ সময়ের সাথে সাথে পানির স্তরের পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করতে এবং জলাশয়ের অবস্থা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

(গ) বৃষ্টিপাতের পরিমাপ (Precipitation measurement) ঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তুষারপাত বা বৃষ্টিপাতের অন্যান্য রূপ, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে ঘটে। হাইড্রোলজিক্যাল সিস্টেমে পানির প্রাপ্যতা বুঝার জন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপ (Groundwater level measurement) ঃ ভূপৃষ্ঠের নিচে যে গভীরতায় ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যায়, যা ভূগর্ভস্থ পানি পর্যবেক্ষণ কূপ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পরিমাপ পানির অবস্থার অন্তর্দৃষ্টি এবং পানির চাহিদা ও রিচার্জের পরিবর্তনের জন্য তাদের তথ্য প্রদান করে।

(ঙ) পানির গুণগত মান পরিমাপ (Water quality measurement) ঃ পানির রাসায়নিক, ভৌত এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন– পানীয়, সেচ এবং জলজ জীবকে সমর্থন করার জন্য এর উপযুক্ততা মূল্যায়ন করতে। পানির গুণগত মান পরিমাপের মধ্যে রয়েছে পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পুষ্টির ঘনত্ব এবং দূষণকারী মাত্রার মতো পরামিতি।

(চ) তুষার পানির সমতুল্য পরিমাপ (Snow water equivalent measurement) ঃ তুষারপাতে থাকা পানির পরিমাণ, যা তুষারপাতসহ অঞ্চলগুলোতে বসন্তের স্রোত এবং পানি সরবরাহ বুঝার জন্য অপরিহার্য।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বারিচক্রের সচিত্র বর্ণনা★

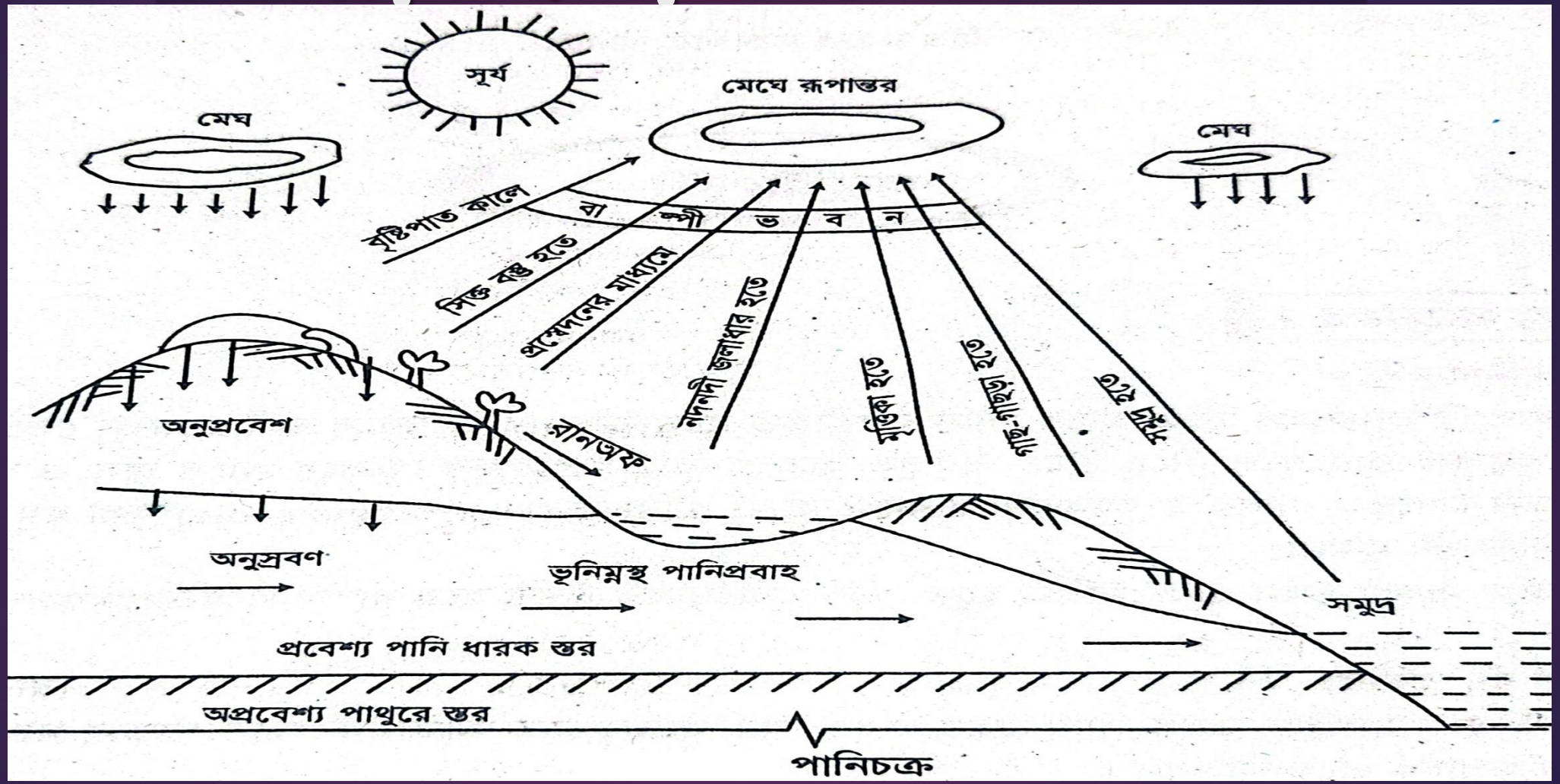

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বারিচক্রের সচিত্র বর্ণনা★

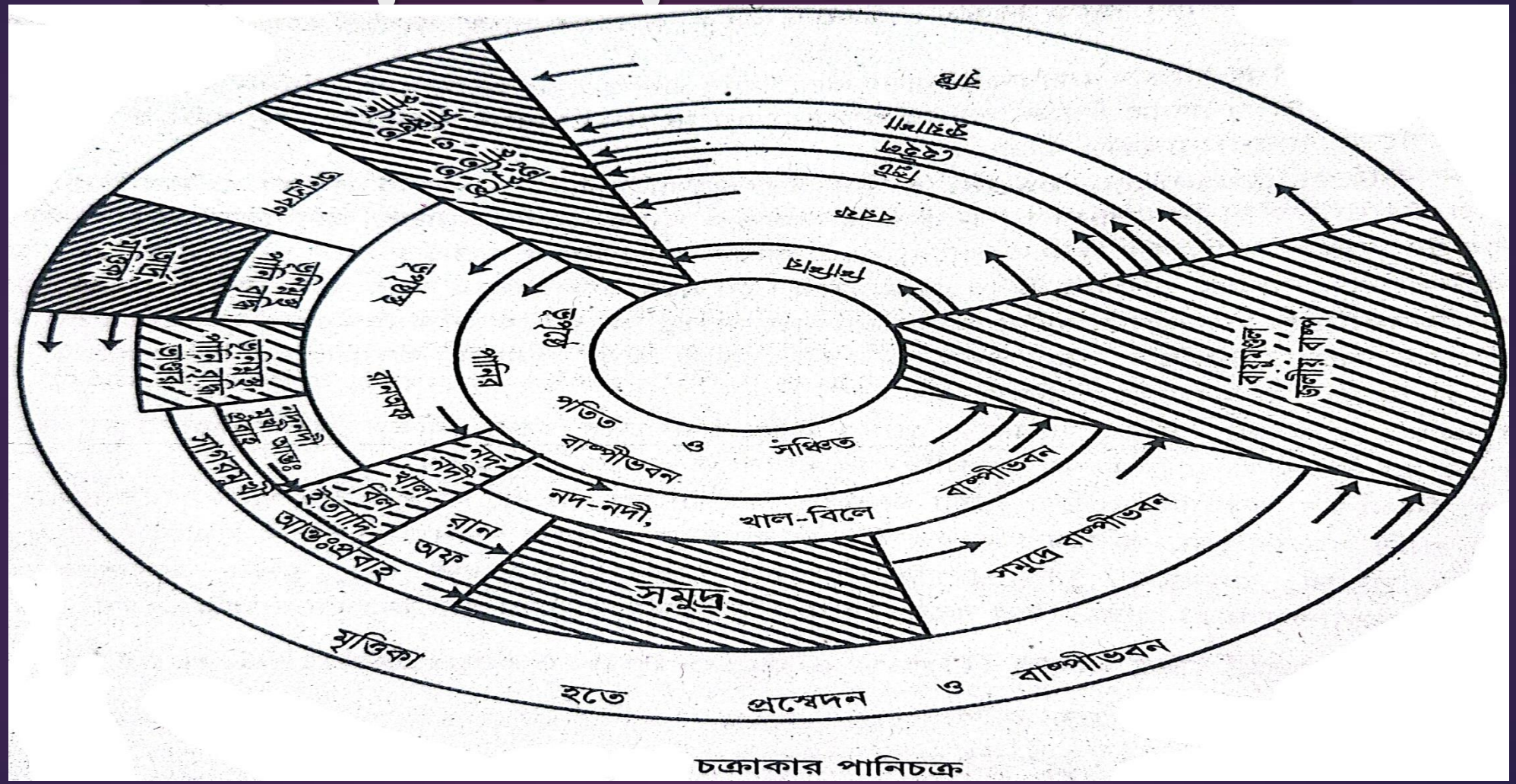

চক্রাকার পানিচক্র

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৩
হাইড্রোমেটিওরোলজি

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. হাইড্রোমেটিওরোলজিক্যাল যন্ত্র

২. বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহ

৩. বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা

৪. কতিপয় কিছু সংঙ্গা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোমেটিওরোলজিক্যাল যন্ত্র★

১। **থার্মোমিটার (Thermometer) ঃ** এটি বায়ুর তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। ঐতিহ্যগত থার্মোমিটারগুলো পারদ বা অ্যালকোহল ব্যবহার করে, যখন আধুনিকগুলো প্রায়শই ইলেকট্রনিক সেন্সর ব্যবহার করে।

২। **ব্যারোমিটার (Barometer) ঃ** এটি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করে, যা আবহাওয়ার ধরনগুলোর পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে। একটি ক্রমবর্ধমান ব্যারোমিটার সাধারণত স্বাভাবিক আবহাওয়া নির্দেশ করে, যখন একটি পতনশীল ব্যারোমিটার একটি ঝড়ের গতিপথ নির্দেশ করতে পারে।

৩। **হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) ঃ** এটি বাতাসে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পরিমাপ করে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আবহাওয়া পরিস্থিতি বুঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার এবং প্রায়শই শতাংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

৪। **অ্যানিমোমিটার (Anemometer) ঃ** এটি বাতাসের গতি পরিমাপ করে এবং বাতাসের দিক নির্ণয় করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি কাপ বা ব্লেড নিয়ে গঠিত, যা বাতাসে ঘোরে, যার গতি ঘূর্ণনের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৫। **উইন্ড ভেন (Wind vane) ঃ** এটি বাতাসের দিক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এটি সাধারণত বাতাসের দিকে নির্দেশ করে এবং এর অবস্থান বাতাসের মূল দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

৬। **বৃষ্টি পরিমাপক (Rain gauge) ঃ** এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টি) পরিমাপ করে। স্ট্যান্ডার্ড নলাকার গেজ এবং আরও উন্নত টিপিং বালতি বা ওজন পরিমাপকসহ বিভিন্ন ধরনের রেইন গেজ ব্যবহার করা হয়।

৭। **তুষার পরিমাপক (Snow gauge) ঃ** এটি বৃষ্টির পরিমাপক অনুরূপ, কিন্তু বিশেষভাবে তুষারপাত জমিয়ে পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোমেটিওরোলজিক্যাল যন্ত্র★

৮। **বাষ্পীভবন প্যান (Evaporation pan) ঃ** বাইরে রাখা প্যান থেকে বাষ্পীভূত পানির পরিমাণ পরিমাপ করে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

৯। **পাইর‍্যানোমিটার (Pyranometer) ঃ** এটি সৌর বিকিরণ বা সূর্যালোকের পরিমাণ যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছায় তা পরিমাপ করে।

১০। **পাইরজিওমিটার (Pyrgeometer) ঃ** এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডল থেকে ইনফ্রারেড বিকিরণ পরিমাপ করে।

১১। **সিলোমিটার (Ceilometer) ঃ** এটি মাটির উপরে মেঘের স্তরের উচ্চতা পরিমাপ করে, যা বিমান চলাচল এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২। **রেডিওসোন্ড (Radiosonde) ঃ** বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং চাপের মতো বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় পরামিতি পরিমাপ করার একটি যন্ত্র রেডিওসোন্ড যন্ত্রটি আবহাওয়া বেলুনের দ্বারা উপরে বহন করা হয়।

১৩। **ডিসড্রোমিটার (Disdrometer) ঃ** এটি বৃষ্টিপাত বা বৃষ্টিপাতের অন্যান্য রূপের আকার এবং বেগ পরিমাপ করে, বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

১৪। **পানির স্তর পরিমাপক (Water level gauge) ঃ** এটি নদী, হ্রদ এবং জলাধারে পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করে, যা বন্যার পূর্বাভাস এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৫। **আবহাওয়ার রাডার (Weather radar) ঃ** বৃষ্টিপাত এবং বায়ুমণ্ডলীয় গতিবিধি শনাক্ত করতে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে। এটি আবহাওয়ার ধরন, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা এবং ঝড়ের গঠন সম্পর্কে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রদান করে।

১৬। **আবহাওয়া উপগ্রহ (Weather satellites) ঃ** এটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বিশ্বব্যাপী চিত্র এবং ডাটা সংগ্রহ করে। মেঘের স্তর, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, গাছপালার অবস্থা এবং আরও অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহ★

(i) বায়ু (Air) ঃ বায়ু হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক বায়ুর প্রধান গ্যাসীয় উপাদান দ্বি-পারমাণবিক নাইট্রোজেন (N_2, আয়তনের 78.09%), দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন (O_2, 20.94%), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2, 0.03%) এবং বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন– আর্গন (Ar, প্রায় 1%), হিলিয়াম (He), জেনন (Xe) এবং ক্রিপটন (Kr)। এ ছাড়া জলীয় বাষ্প বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

(ii) বায়ুমণ্ডল বা জীবমণ্ডল (Ecosphere or Biosphere) ঃ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ বাস করে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের একটি সীমিত অঞ্চল জীব প্রতিপালিত হয়। বায়ুমণ্ডলে জীব প্রতিপালনের উপযোগী অঞ্চলসমূহকে একত্রে বায়ুমণ্ডল বা জীবমণ্ডল বলা হয়। জীবগোষ্ঠী এবং ভৌত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র একত্রিত হয়ে তৈরি করে বায়ুমণ্ডল বা জীবমণ্ডল। জীবমণ্ডলের ৩টি অংশ; যথা–

(ক) বারি জীবমণ্ডল (Hydrobiosphere) ঃ সমুদ্রের উপরের অংশ (উপরিতল থকে ১১,০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আলো পৌঁছাতে পারে), জলাশয়, নদী এবং হ্রদের বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা বারি জীবমণ্ডল (Hydrobiosphere) গঠিত হয়।

(খ) অশ্ব জীবমণ্ডল (Lithobiosphere) ঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে মৃত্তিকা স্তরের সর্বত্র বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভূত্বক থেকে কয়েক মিটার গভীরতা পর্যন্ত যে-সব বাস্তুতন্ত্র দেখা যায়, তাদের মিলনেই অশ্ম জীবমণ্ডল গঠিত হয়। হিমালয়ের ৯০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সবুজ উদ্ভিদ দেখা যায়। কিন্তু তার বেশি উচ্চতায় এবং বরফখণ্ডে জীবের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

(গ) বায়ু জীবমণ্ডল (Atmos Biosphere) ঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ার এবং নিম্ন স্ট্রাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে জীব বাস করে। এ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা বায়ু জীবমণ্ডল গঠিত হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা★

পৃথিবী পরিবেষ্টিত বায়ুর পরিমণ্ডলকে বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) বলা হয়। ভূপৃষ্ঠ হতে দূরত্ব অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত চারটি স্তরে বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা—

১। **ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) ঃ** ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলা হয়। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব সর্বাধিক। ট্রপোস্ফিয়ার স্তরেই ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে।

২। **স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) ঃ** ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরের বায়ু স্তরটি স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ১৫ কিমি থেকে ৫০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের অঞ্চলকে স্ট্রাটোস্ফিয়ার বলে। বায়ুমণ্ডলের এ স্তরে 'ওজোন' (Ozone, O_3) গ্যাসের স্তর অবস্থান করে।

৩। **আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) ঃ** ৫০ কিমি থেকে ৫০০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয়। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব কম থাকে। এ ছাড়া আয়নোস্ফিয়ার অংশে পারমাণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি থাকে এবং আণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম থাকে।

৪। **এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) ঃ** আয়নোস্ফিয়ারের শেষ ঊর্ধ্ব সীমানা থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর স্তরকে এক্সোস্ফিয়ার বলা হয় (৫০০ কিমি এবং উপরে)। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম এবং ক্রমশ পাতলা হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় আর বায়ু থাকে না।

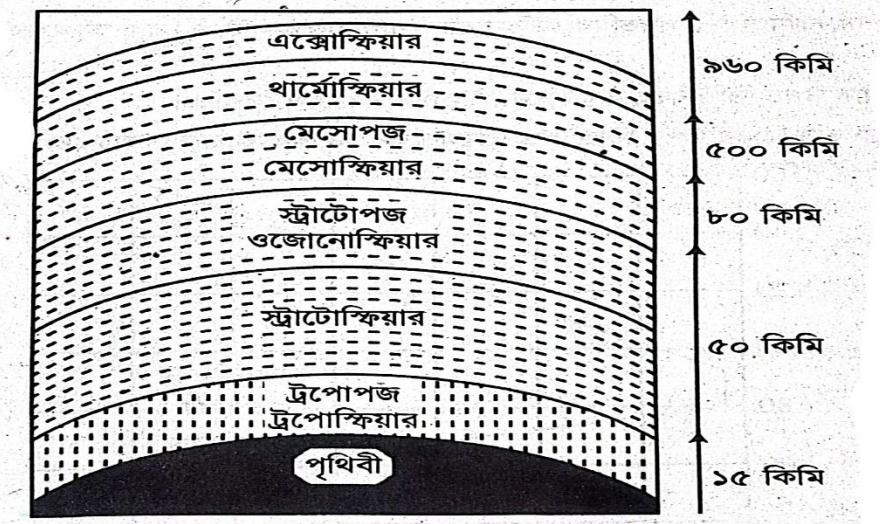

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★ঘূর্ণিঝড়★

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★ঝঞ্ঝাবাত★

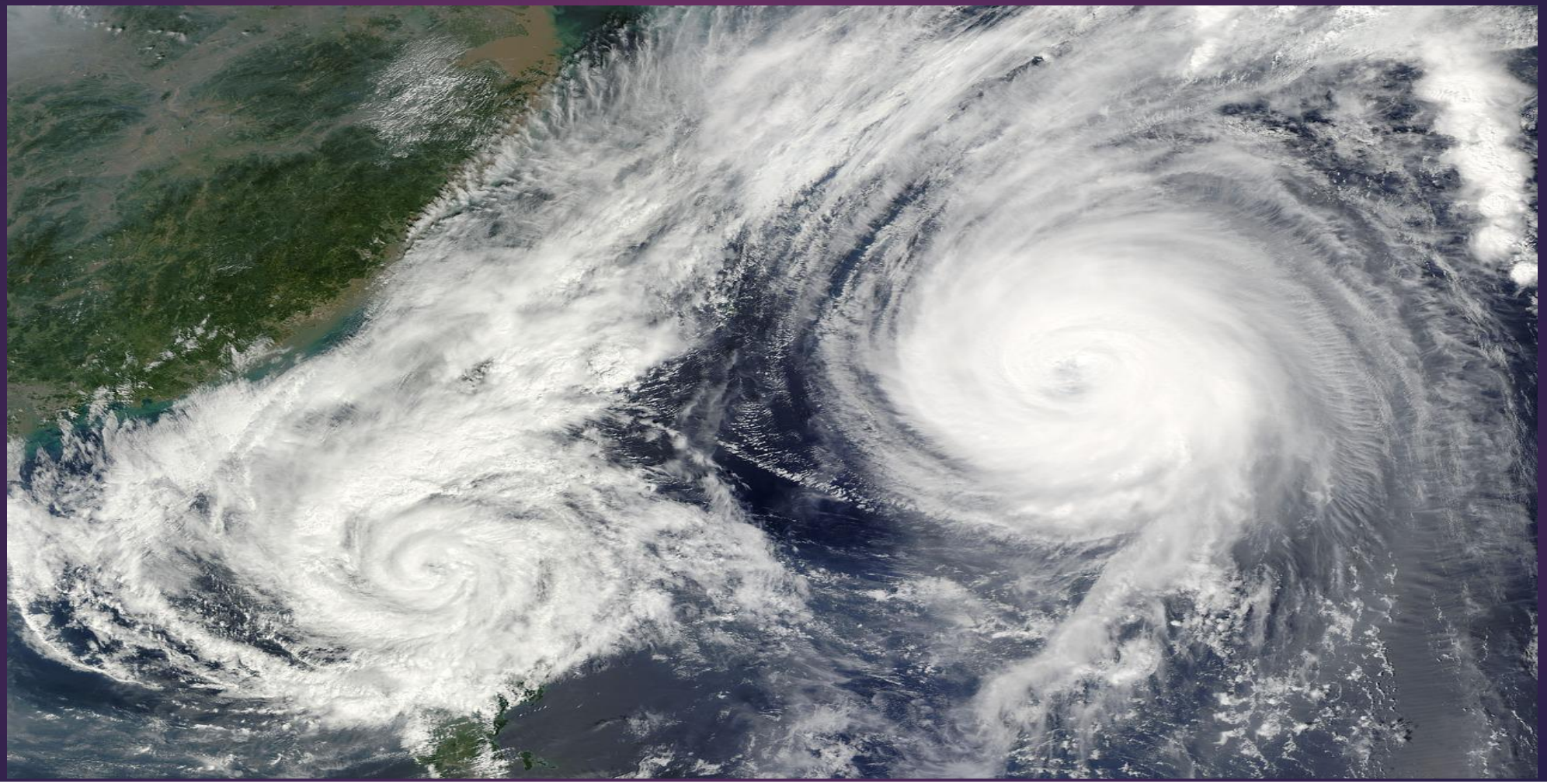

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বজ্রঝড়★

বজ্রঝড় হচ্ছে এক প্রকার ক্রান্তীয় ঝড় যা বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো সহযোগে সংঘটিত ভারি বর্ষণ অথবা শিলাবৃষ্টি ।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৪

অধঃক্ষেপণের পরিচিতি

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. অধঃক্ষেপণের সংঙ্গা

২. অধঃক্ষেপণের গঠন

৩. অধঃক্ষেপণের প্রকারভেদ

৪. কতিপয় কিছু সংঙ্গা

৫. বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অধঃক্ষেপণের সংজ্ঞা★

বায়ুমন্ডল হতে পানি বা পানিজাত সামগ্রীর ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়াই অধঃক্ষেপণ বা প্রিসিপিটেশন। যেমনঃ বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অধঃক্ষেপণের গঠন★

অধঃক্ষেপণের গঠন (Formation of precipitation) ঃ

নিচে উপস্থাপিত পরিবেশ ও বিষয়াদির আনুকূল্যে অধঃক্ষেপণের গঠন হয়ে থাকে।

(i) **পর্যাপ্ত আর্দ্রতার উপস্থিতি ঃ** বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার যোগান দেয় বাষ্পীভবনের জলীয় বাষ্প। বাষ্পীভবন ও অধঃক্ষেপণের মধ্যে ভারসাম্যমূলক নীতি বিদ্যমান এবং বায়ুমণ্ডলে সব সময়ই আর্দ্রতা বিদ্যমান।

(ii) **বায়ু পরিপৃক্ত ও শীতল হওয়া ঃ** বায়ু পরিপৃক্ত হতে হলে শীতল হওয়ার জন্য বায়ুরাশি উপরে উঠা আবশ্যক। বায়ুস্তর সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে উপরে উঠে এবং শীতল হয়ে বায়ু পরিপৃক্ত হয়।

(iii) **ঘূর্ণিবার্তে শীতল হয়ে অধঃক্ষেপণ ঃ** ঘূর্ণিবাতের কেন্দ্রে নিম্নচাপ এবং চারপাশে ক্রমান্বয়ে বায়ুর চাপ বেশি থাকায় চারদিকের অঞ্চলে অধঃক্ষেপণ ঘটায়।

(iv) **শৈলোৎক্ষেপে শীতল হয়ে অধঃক্ষেপ ঃ** জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কালে উঁচু পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে শীতল হয়ে পাহাড়-পর্বতের প্রতিবাত দিকে (Windward side) বৃষ্টিপাত ঘটায়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অধঃক্ষেপণের প্রকারভেদ★

অধঃক্ষেপণ তিন (০৩) ধরণের হয়ে থাকে।

১. ঘূর্ণি অধঃক্ষেপণ

২. শৈলোৎক্ষেপ অধঃক্ষেপ

৩. পরিচলন অধঃক্ষেপণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অধঃক্ষেপণের প্রকারভেদ★

ঘূর্ণি অধঃক্ষেপণ (Cyclonic precipitation) ঃ

(i) সংঘর্ষ বা সীমান্ত অধঃক্ষেপণ (Frontal precipitation) ঃ শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ (Air mass) মুখোমুখি প্রবাহিত হলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপর দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। এর ফলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর স্পর্শে প্রসারিত ও শীতল হয়ে উভয় বায়ুর সীমান্ত বরাবর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ধরনের বৃষ্টিকে সীমান্ত বৃষ্টি বা সংঘর্ষ বৃষ্টি (Frontal rain) বলা হয়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম অংশে আর্দ্র বায়ুর সাথে শুষ্ক শীতল বায়ুর সংঘর্ষে কালবৈশাখি ঝড়ের সময় বজ্র-বিদ্যুৎসহ সংঘটিত বৃষ্টিপাতই সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত।

(ii) অসীমান্ত অধঃক্ষেপণ (Non-frontal precipitation) ঃ অত্যধিক তাপের কারণে কোনো স্বল্প পরিসরের স্থানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে চারপাশের উচ্চ চাপ অঞ্চলের জলীয় বাষ্পপূর্ণ পরিপৃক্ত বায়ু ঘূর্ণিবাতের কেন্দ্রে এসে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে যে অধঃক্ষেপণ ঘটায়, তাকে অসীমান্ত (Non-frontal) অধঃক্ষেপণ বলা হয়। এ জাতীয় অধঃক্ষেপণ 12 হতে 24 ঘণ্টায় 375 মিলিমিটারের বেশি অধঃক্ষেপণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ুর আগে ও পরে বঙ্গোপসাগরে এ ধরনের ঘূর্ণিবাত সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অধঃক্ষেপণের প্রকারভেদ★

শৈলোৎক্ষেপে অধঃক্ষেপ ঃ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কালে উঁচু পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে শীতল হয়ে পাহাড়-পর্বতের প্রতিবাত দিকে (Windward side) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ধরনের বৃষ্টিকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic rain) বলে। শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতকালে পর্বতের অপর পাশে অর্থাৎ বৃষ্টিছায় (Rain shadow) বা অনুবাতে (Leeward side) শুষ্ক বায়ু থাকায় সাধারণত কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

পরিচলন অধঃক্ষেপণ ঃ নিম্নচাপমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উত্তপ্ত হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে ও প্রসারিত হয়। ফলত বায়ুর চাপ সমতা রক্ষার জন্য চারিপাশের শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে এবং এ বায়ুও উত্তপ্ত-হালকা হয়ে উপরে উঠে প্রসারিত হয়। এভাবে তাপ পরিচলনের মাধ্যমে বায়ুর তাপ হ্রাসের ফলে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং তা হতে বৃষ্টি বিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। পরিচলন প্রক্রিয়ায় উষ্ণতার বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্ট বৃষ্টিকে পরিচলন বৃষ্টি (Convection rain) বলা হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পানি থাকে এবং এ সময় সূর্যের তাপ অধিক হয়। তাই প্রায় সময়ই বজ্র-বিদ্যুৎসহ স্বল্পস্থায়ী ভারি পরিচলন বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এ বৃষ্টিপাত দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বৃষ্টিপাত শেষে আকাশ নির্মল ও মেঘমুক্ত দেখায়। এ বৃষ্টি সাধারণত দিনের উষ্ণতম সময়ে হয়ে থাকে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★কতিপয় কিছু সংজ্ঞা★

১। **ড্রিজেল (Drizzle) ঃ** সাধারণত 0.5 মিলিমিটার আকারের সূক্ষ্ম ফোঁটার হালকা বৃষ্টিকে ড্রিজেল বলা হয়। এ জাতীয় ফোঁটায় ঘণ্টায় 1 মিলিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয় না।

২। **বৃষ্টি (Rain) ঃ** বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প মেঘমালায় রূপায়িত হওয়ার পর ফোঁটায় ফোঁটায় পতনকে বৃষ্টি (Rain) বলা হয়। সাধারণত এ জাতীয় ফোঁটার আকার 0.5 মিমি হতে 6.25 মিমি হয়ে থাকে।

৩। **গ্লেজ (Glaze) ঃ** ড্রিজেল বা বৃষ্টি পতনকালে ঠান্ডা বস্তুর সান্নিধ্যে এসে বরফকণার আকারে পতিত হলে এটাকে গ্লেজ বলা হয়।

৪। **স্লিট (Sleet) ঃ** প্রায় জমাটবাঁধা অবস্থায় তুষাররূপ হিমশীতল উষ্ণতায় পতিত অধঃক্ষেপণকে স্লিট বলা হয়।

৫। **স্নো (Snow) ঃ** বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সরাসরি বরফ হিসেবে পরিণত হলে এবং উক্ত বরফকণা ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে এগুলোকে স্নো (Snow) বলা হয়।

৬। **হেল (Hail) ঃ** ঘূর্ণীঝড়ের প্রভাবে 15 মিমি-এর অধিক ব্যাসের বরফকণা ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে এগুলোকে হেল বলা হয়।

৭। **শিশির (Dew) ঃ** ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প হিমশীতল অবস্থায় এসে শিশির বিন্দু তৈরি করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু★

পার্থক্যের বিষয়	আবহাওয়া	জলবায়ু
১। সংজ্ঞাগত	কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।	কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার অবস্থানের সম্পর্ককে জলবায়ু বলে।
২। উপাদান	এর উপাদানগুলো হলো– বায়ুর চাপ, তাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।	জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারীর উপাদানগুলো হলো– অক্ষাংশ, সমুদ্রের দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত, ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ইত্যাদি।
৩। বিস্তার	এটি ক্ষুদ্র এলাকার ক্ষণস্থায়ী অবস্থা।	এটি একটি দীর্ঘ এলাকা অর্থাৎ কোনো দেশ বা মহাদেশের বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা।
৪। পরিবর্তন	এটি দৈনন্দিন পরিবর্তন হয়।	এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল নয়।
৫। গড়	কয়েক দিনের বা সপ্তাহের অবস্থান পর্যালোচনা করে আবহাওয়ার গড় বের করা হয়।	কমপক্ষে ২৫–৩০ বছরের গড় অবস্থান হতে জলবায়ু সম্পর্কে জানা যায়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৫

অধঃক্ষেপণের পরিমাপ

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের রেখাচিত্র

২. নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র

৩. নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা

৪. রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র

৫. রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা

৬. রাডারের সাহায্যে বৃষ্টিপাত পরিমাপ

৭. বৃষ্টিপাতের স্যাটেলাইট পরিমাপ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের রেখাচিত্র★

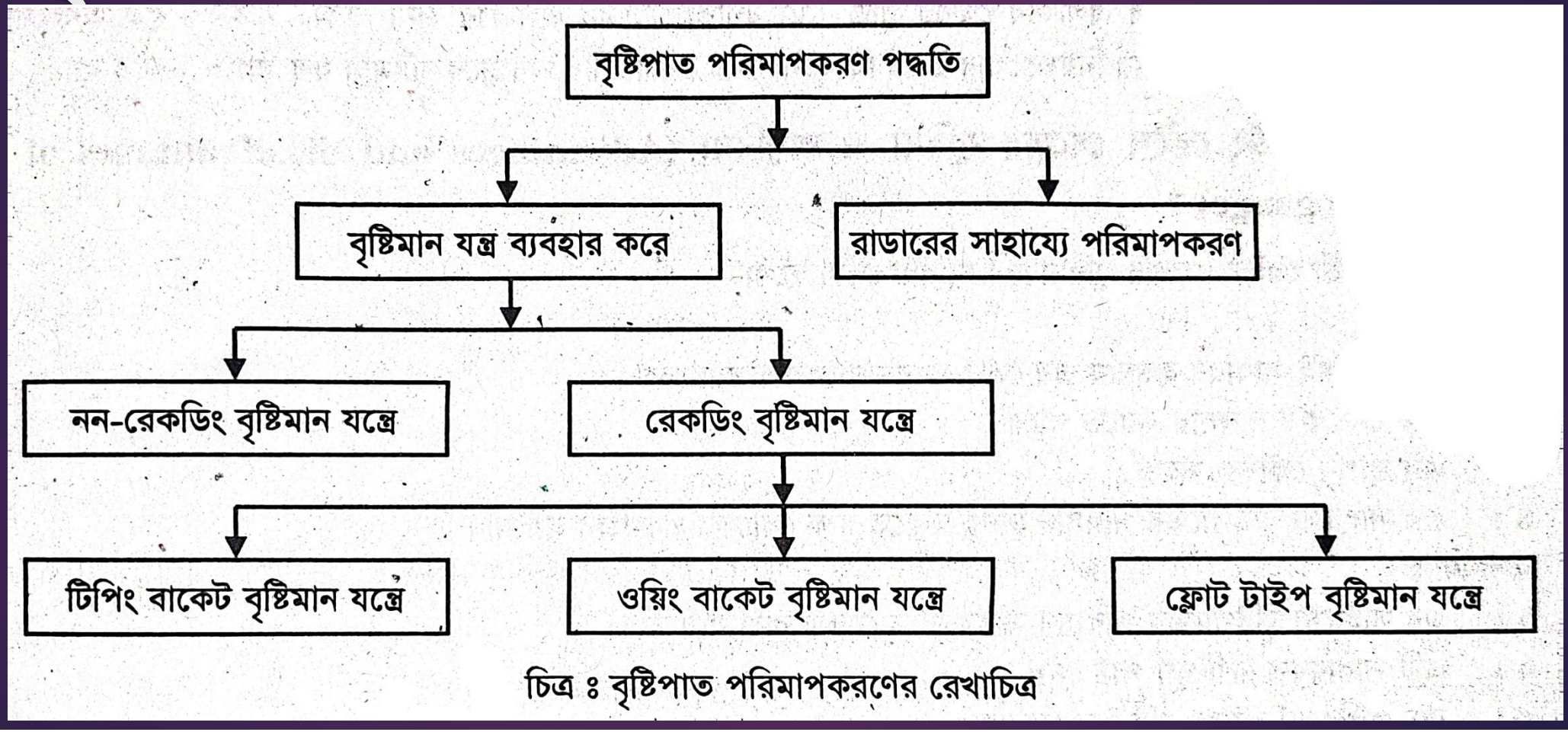

চিত্র ঃ বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের রেখাচিত্র

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র★

এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্র সর্বাধিক ব্যবহৃত বৃষ্টিমান যন্ত্র। এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্রের মধ্যে সাইমন বৃষ্টিমান যন্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ ক্ষেত্রবিশেষে রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। সাইমন নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের অঙ্গগুলো হচ্ছে–

১। ম্যাসনারি বা কংক্রিটের তৈরি ভিত্তি

২। কংক্রিটের বা ম্যাসনারি ভিত্তিতে আটকানো ধাতব সিলিন্ডার, যার ভিতরে কাচের বোতল ঢুকানো থাকে

৩। কাচের বোতলের সমব্যাসের ফানেল বা চুঙ্গি।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র★

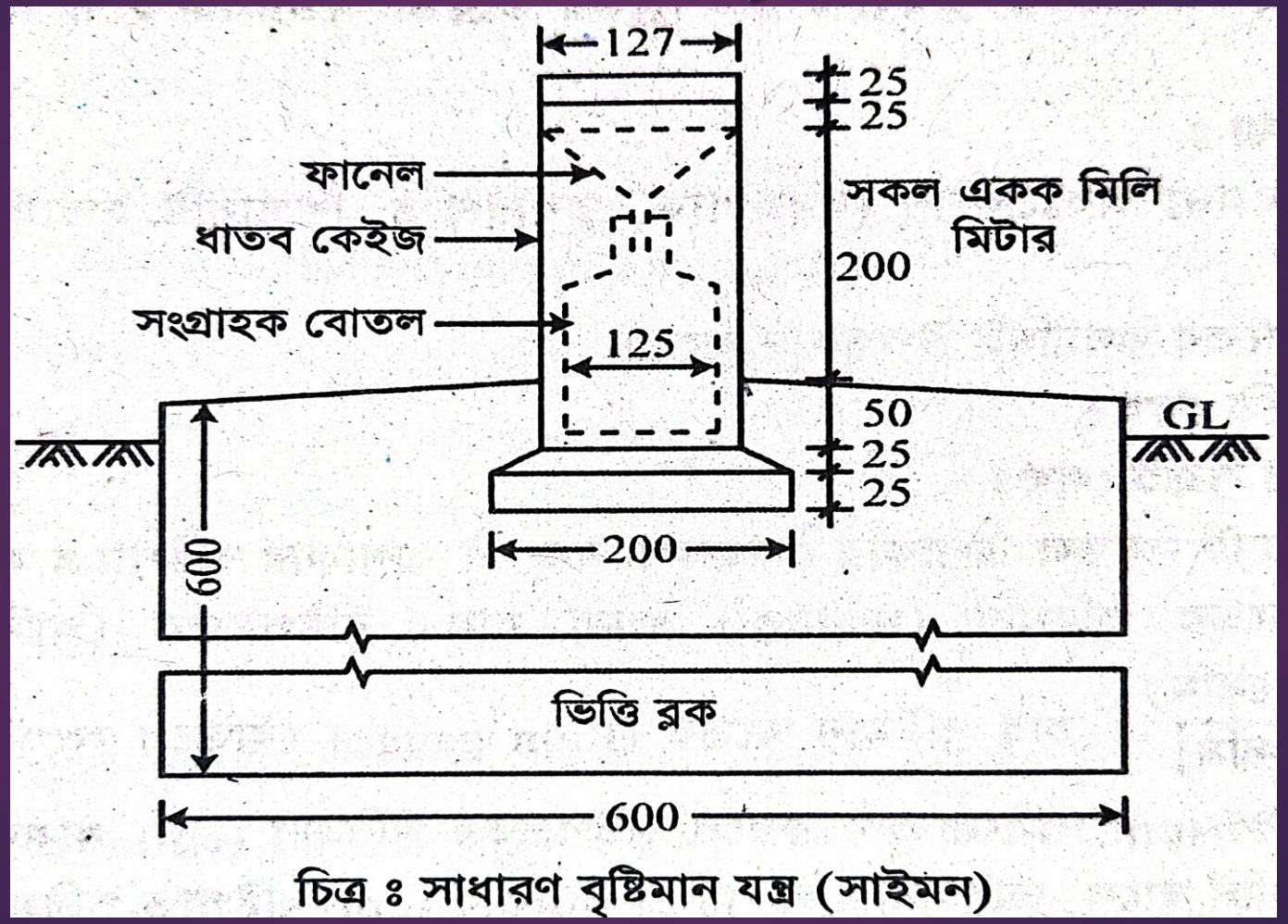

চিত্র ঃ সাধারণ বৃষ্টিমান যন্ত্র (সাইমন)

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা★

সুবিধা ঃ

১। একটি খুবই সাধারণ হওয়ায় এর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

২। এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।

৩। এর স্থাপন কৌশল সহজ।

৪। এর সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা ঃ

১। এর সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সঠিকভাবে রেকর্ড করা যায় না।

২। এটি সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ পাঠ দেয়।

৩। কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র★

রেকডিং রেইন গেইজকে স্বয়ংক্রিয় রেইন গেইজও বলা হয়। রেকর্ডিং টাইপ রেইন গেজে (Rain gruge) পাত্রের ভিতরে বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হওয়া ও উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) পেন্সিল পয়েন্ট দিয়ে বৃষ্টিপাতের হার গ্রাফ পেপারে অঙ্কিত হতে থাকে। এই যন্ত্রের ব্যবহার ব্যয়বহুল।

স্বয়ংক্রিয় রেইনগেজ সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা–

১। টিপিং বাকেট রেইন গেজ (Tipping bucket rain gauge)

২। ওয়িং বাকেট রেইন গেজ (Weighing bucket rain gauge)

৩। ফ্লোট টাইপ রেইন গেজ (Float type rain gauge)

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা★

সুবিধা ঃ

১। রেকর্ডিং রেইন গেজের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃষ্টি পরিমাপ করা যায় বলে একে রেকর্ডিং রেইন গেজ বলা হয়।

২। রেইন গেজ-এর পাত্রের ভিতর বৃষ্টির পানি জমা হলে ও উচ্চতা বাড়লে গ্রাফ পেপারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃষ্টিপাতের গ্রাফ অঙ্কিত হতে থাকে।

৩। উক্ত গ্রাফ হতে 24 ঘণ্টা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছাড়াও দিনের যে-কোনো সময়ের বৃষ্টিপাতের হার নির্ণয় করা যায়।

৪। উক্ত গ্রাফ হতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বৃষ্টির পরিমাণও জানা যায়।

৫। মাপ পর্যবেক্ষণের জন্য গেজের নিকট সার্বক্ষণিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা ঃ

১। এই যন্ত্র ব্যয়সাপেক্ষ।

২। পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★রাডারের সাহায্যে বৃষ্টিপাত পরিমাপ★

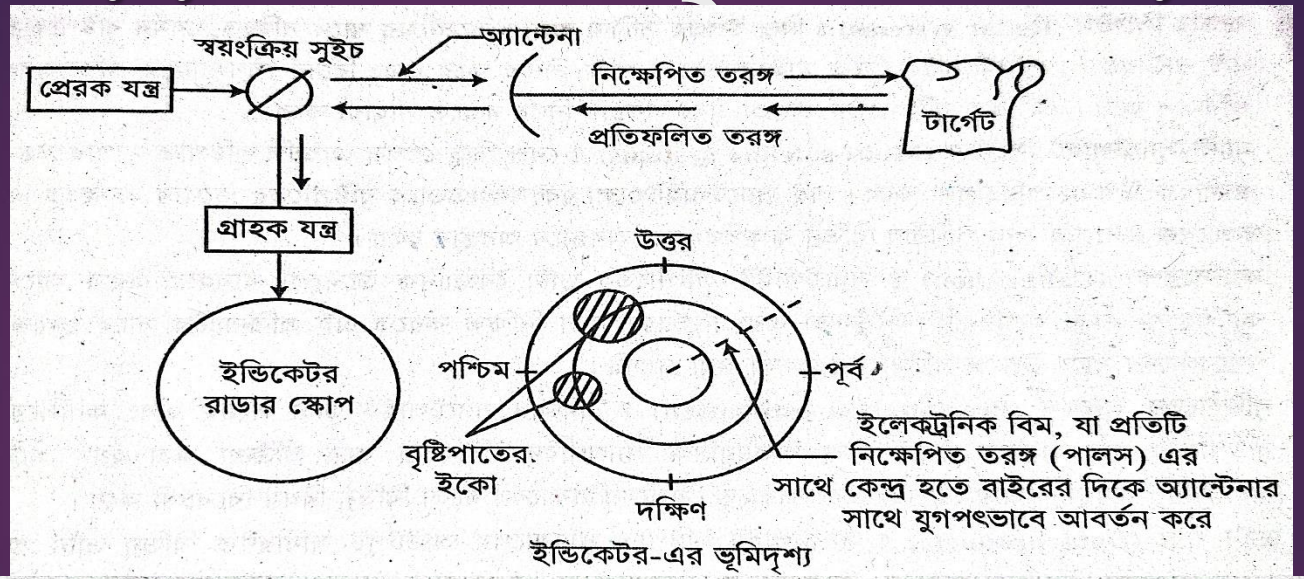

রাডার-এর প্রেরক যন্ত্র (Transmitter) হতে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (পালস) ন্যারো বিম অ্যান্টেনার মাধ্যমে টার্গেট (বৃষ্টি, মেঘ ইত্যাদি) এর দিকে নিক্ষেপ বা প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গ টার্গেটে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিনিয়ত একই অ্যান্টেনা শনাক্ত ও গ্রহণ করে রাডারস্কোপে প্রেরণ করে। এ সকল তরঙ্গগুলো ইন্ডিকেটর বা রাডারস্কোপে এসে এগুলোকে বিবর্ধিত ও রূপান্তর করে ভিডিও রূপদান করে। বিনা টার্গেটে প্রতিফলিত তরঙ্গ অসীম অনুজ্জ্বল, ছোট টার্গেটে প্রতিফলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল দাগ এবং বৃষ্টিপাতের মতো প্রসারিত বৃহত্তর টার্গেট উজ্জ্বল জোড়া লাগানো টুকরার মতো চিহ্ন রাডারস্কোপে প্রদর্শিত হয়। পালস প্রেরণ ও ইকো গ্রহণের মাঝে অতিক্রান্ত সময় হতে রাডার ও টার্গেটের মাঝে দূরত্ব এবং ইকো গ্রহণকালে অ্যান্টেনা হতে টার্গেটের দিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণীত হয়। টার্গেটের দূরত্ব ও দিক রাডারস্কোপে প্রদর্শিত হয়। উল্লম্বতলে অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৃষ্টিপাতের কাঠামো, উচ্চতা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এসকল তথ্যাদি হতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাতের স্যাটেলাইট পরিমাপ★

বৃষ্টিপাতের উপগ্রহ পরিমাপ কীভাবে কাজ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো–

১। **স্যাটেলাইট সেন্সর (Satellite sensors) ঃ** বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত উপগ্রহগুলো রেডিওমিটার এবং রাডার সিস্টেমসহ বিভিন্ন সেন্সর দিয়ে সজ্জিত। এই যন্ত্রগুলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন দিক এবং বৃষ্টিপাতের সাথে এর মিথস্ক্রিয়া অনুভব করতে পারে।

২। **নিষ্ক্রিয় মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার (Passive microwave radiometers) ঃ** বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রাথমিক যন্ত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো প্যাসিভ মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার। এটি বায়ুমণ্ডলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে পানির কণা দ্বারা নির্গত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ শনাক্ত করে। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তীব্রতা বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত।

৩। **রাডার সিস্টেম (Radar systems) ঃ** কিছু উপগ্রহ সক্রিয় রাডার সিস্টেমের সাথে সজ্জিত, যেমন বৃষ্টিপাত রাডার (PR)। এই রাডারগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে মাইক্রোওয়েভ শক্তি নির্গত করে এবং রিটার্ন সিগন্যালের শক্তি এবং সময় বিলম্ব পরিমাপ করে। এই তথ্য বৃষ্টিপাতের তীব্রতা এবং অবস্থান নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

৪। **মাল্টি-স্যাটেলাইট সিস্টেম (Multi-satellite systems) ঃ** বেশ কিছু স্পেস এজেন্সি বৃষ্টিপাত মাপার যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত একাধিক উপগ্রহ পরিচালনা করে। এই স্যাটেলাইটগুলো কৌশলগতভাবে বৃষ্টিপাতের তথ্যের ক্রমাগত এবং বিশ্বব্যাপী কভারেজ প্রদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথ এবং অবস্থানে অবস্থান করে।

৫। **ক্যালিব্রেশন (Calibration) ঃ** স্যাটেলাইট বৃষ্টিপাতের ডাটা বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার আগে যন্ত্রগুলোকে ক্যালিব্রেশন করা অপরিহার্য। নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে এই প্রক্রিয়াটির সাথে স্থলভিত্তিক বৃষ্টিপাত পর্যবেক্ষণের সাথে উপগ্রহ পরিমাপের তুলনা করা জরুরি।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাতের স্যাটেলাইট পরিমাপ★

৬। **বৃষ্টিপাতের অনুমান (Precipitation estimation) ঃ** একবার স্যাটেলাইট ডাটা সংগ্রহ এবং ক্যালিব্রেট করা হলে, বৃষ্টিপাতের হার অনুমান করার জন্য অত্যাধুনিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করা হয়। অ্যালগরিদমগুলো বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহৃত সেন্সরের প্রকারের মতো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে।

৭। **ডাটা পণ্য (Data products) ঃ** স্যাটেলাইট বৃষ্টিপাত পরিমাপের আউটপুট সাধারণত বিভিন্ন ডাটা পণ্যের আকারে উপস্থাপিত হয়, যেমন– বৃষ্টিপাতের হার মানচিত্র, নির্দিষ্ট সময়কালে জমা হওয়া বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিপাতের তীব্রতা প্রোফাইল। এই পণ্যগুলো আবহাওয়ার পূর্বাভাস, জলবায়ু অধ্যয়ন এবং হাইড্রোলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

বৃষ্টিপাতের স্যাটেলাইট পরিমাপের সুবিধা ঃ

১। **গ্লোবাল কভারেজ (Global coverage) ঃ** স্যাটেলাইটগুলো দূরবর্তী এবং দুর্গম অঞ্চলে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করতে পারে, যেখানে স্থলভিত্তিক পর্যবেক্ষণগুলো দুষ্প্রাপ্য।

২। **রিয়েল-টাইম মনিটরিং (Real-time monitoring) ঃ** স্যাটেলাইট ডাটা কাছাকাছি রিয়েল-টাইমে পাওয়া যায়, যা আবহাওয়াবিদদের বৃষ্টিপাতের ঘটনাগুলো ঘটলে পর্যবেক্ষণ করতে দেয়।

৩। **বড় আকারের বিশ্লেষণ (Large-scale analysis) ঃ** স্যাটেলাইট ডাটা বৃহৎ ভৌগলিক এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধরন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অধ্যয়ন করতে সক্ষম করে, যা বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের বুঝার জন্য সহায়তা করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৬

বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. বৃষ্টিপাতের ডাটা

২. অপটিমাম নাম্বার

৩. বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ

৪. বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়

৫. বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাতের ডাটা★

(i) **তারিখ এবং সময় (Date and time) ঃ** নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময় যখন বৃষ্টিপাত হয়েছিল বা রেকর্ড করা হয়েছিল।

(ii) **বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (Rainfall amount) ঃ** বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণত মিলিমিটার (মিমি) বা ইঞ্চি (inc)-তে প্রকাশ করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ে; যেমন– প্রতি ঘণ্টা, প্রতি দিন, প্রতি মাস বা প্রতি বছর।

(iii) **সময়কাল (Duration) ঃ** বৃষ্টির পরিমাণ সংগ্রহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কে সময়কাল বলে। এটি ঘণ্টা, দৈনিক, মাসিক বা বার্ষিক সময়কালও হতে পারে।

(iv) **অবস্থান (Location) ঃ** ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক; যেমন– অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশসহ বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয়েছে এমন অবস্থানের নাম বা একটি নির্দিষ্ট আবহাওয়া স্টেশনের নাম।

(v) **বৃষ্টিপাতের ধরন (Rainfall type) ঃ** কখনো কখনো বৃষ্টিপাতের ডাটা বিভিন্ন ধরনের বৃষ্টিপাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে; যেমন– গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, হালকা বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টি বা বজ্রপাত।

(vi) **উৎস (Source) ঃ** বৃষ্টিপাতের তথ্য সংগ্রহ এবং রেকর্ড করার জন্য দায়ী সত্তা বা সংস্থা; যেমন– আবহাওয়া সংস্থা, আবহাওয়া স্টেশন বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অপটিমাম নাম্বার★

$$N = \left(\frac{C_v}{p}\right)^2$$

এখানে,

N = প্রয়োজনীয় রেইনগেইজ স্টেশন সংখ্যা

C_v = রেইনগেজ স্টেশনের বৃষ্টিপাতের তারতম্যের গুণাঙ্ক

P = গড় বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের ত্রুটির শতকরা হার

★বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ★

(i) বার চিত্র (Bar diagram) ঃ এই চিত্রে বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে মাসের বিপরীত বৃষ্টিপাতের (Rainfall) পরিমাণ দেখানো হয়। আয়তাকার বারের উচ্চতা বৃষ্টির (Rain) পরিমাণ নির্দেশ করে। বৃষ্টিপাতের (Rainfall) বার চিত্র নিচে দেখানো হলো–

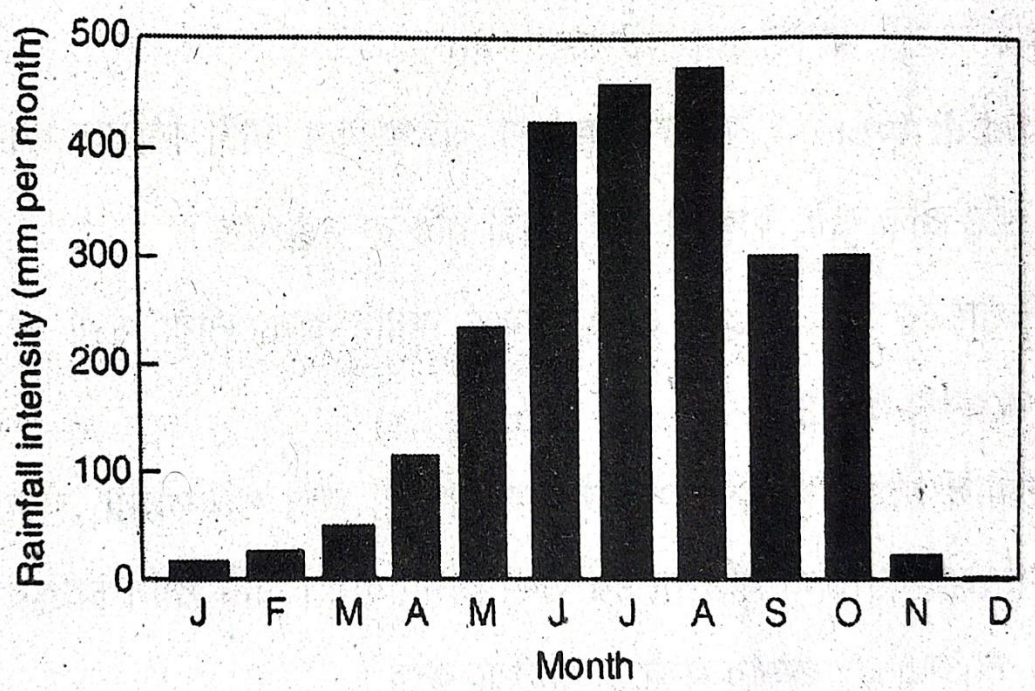

চিত্র ঃ বৃষ্টিপাতের বার ডায়াগ্রাম

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ★

(ii) অর্ডিনেট গ্রাফ (Ordinate graph) ঃ যে-কোনো বছরের বৃষ্টিপাত অর্ডিনেট লাইন দ্বারা অর্ডিনেট গ্রাফে দেখানো হয়। নিচের চিত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

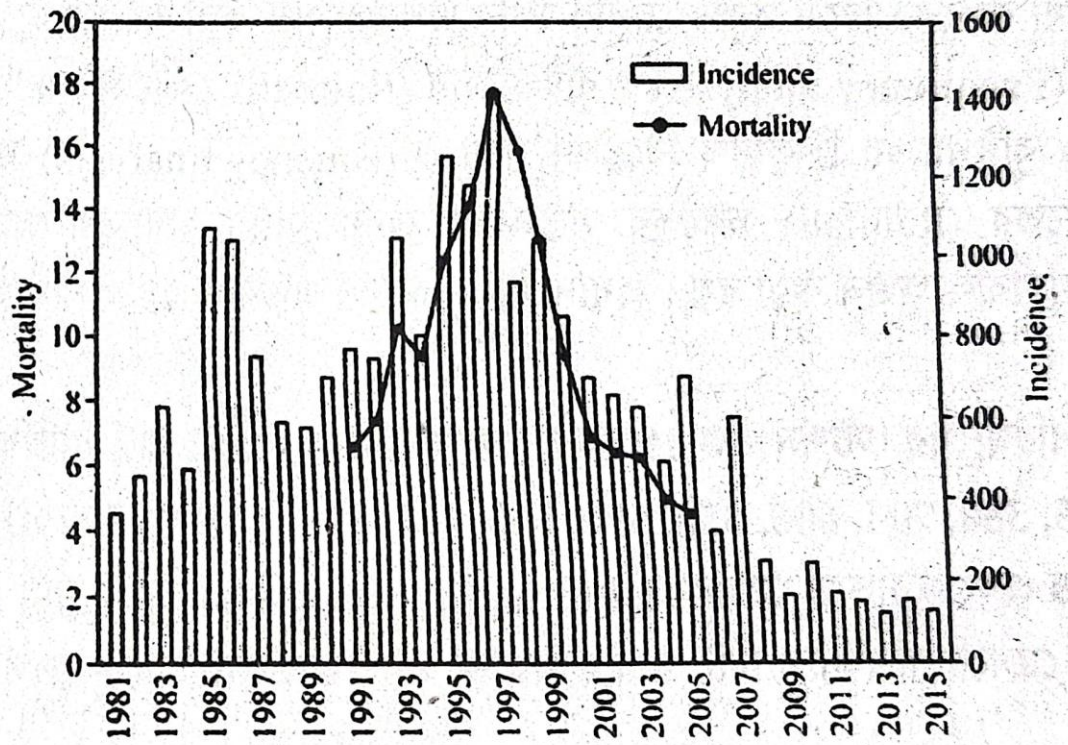

চিত্র ঃ অর্ডিনেট গ্রাফ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ★

(iii) ক্রোনোলজিক্যাল চিত্র (Chronological chart) ঃ নিচের রেখাচিত্র দ্বারা বছরের বিপরীত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হলো–

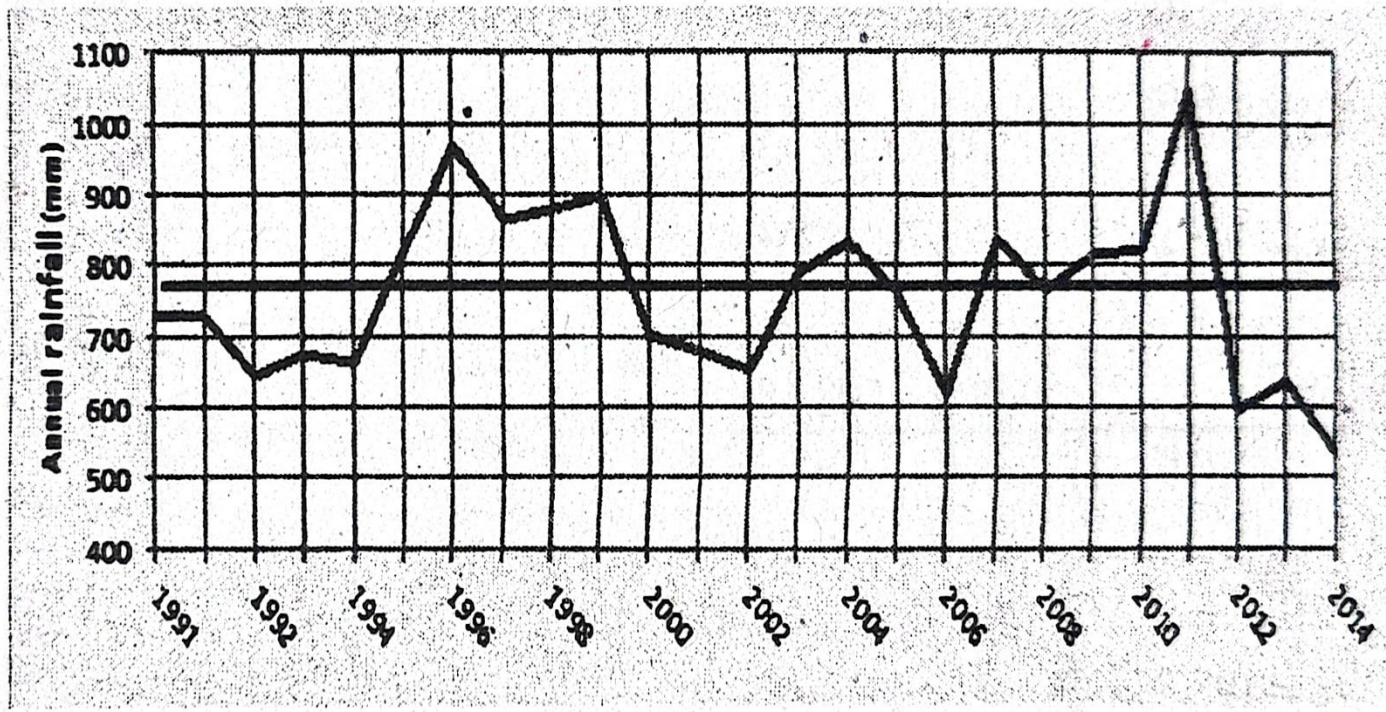

চিত্র ঃ ৬.৩ বৃষ্টিপাতের ক্রোনোলজিক্যাল চার্ট

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়★

সকল এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান হয় না। একটি বৃহৎ এলাকার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানার জন্য সে এলাকার রেইন গেজের মাধ্যমে বৃষ্টির পরিমাণ জানতে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গড় বৃষ্টির গভীরতাকে সমগভীরতার বৃষ্টিপাতও বলা হয়। কখনো বৃষ্টির প্রকৃত গড় গভীরতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ রেইনগেজ (Raingauge) কম এলাকার খুবই ছোট নমুনা দেয়। সাধারণ তিনটি পদ্ধতি আছে, যা রেইন গেজের (Raingauge) কাজ করে এবং তাদের মান নিকটবর্তী হয়। পদ্ধতি তিনটি হলো–

(ক) গাণিতিক গড় পদ্ধতি (Arithmetic mean method)

(খ) থিসেন পলিগন পদ্ধতি (Thiessen polygon method) এবং

(গ) আইসোহাইটাল পদ্ধতি (Isohyetal method)।

গাণিতিক গড় পদ্ধতি (Arithmetic mean method) ও থিসেন পলিগন পদ্ধতি (Thiessen polygon method) বিশেষ দক্ষতা বা বিচার ছাড়াই সম্পূর্ণ গাণিতিক, অপরপক্ষে আইসোহাইটাল পদ্ধতি (Isohyetal method) দ্বারা অর্জিত ফলাফল যথেষ্ট সঠিক।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত★

১। **সমুদ্র হতে দূরত্ব ঃ** গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক আর্দ্রতা থাকায় জলভাগের নিকটবর্তী স্থান চট্টগ্রামে দিনাজপুর অপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

২। **উচ্চতা ঃ** সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে যে স্থান যত উঁচু, সে স্থানে বেশি শীতল থাকায় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

৩। **বায়ুপ্রবাহ ঃ** সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকায় ঐ বায়ু যে এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি।

৪। **পর্বতের অবস্থিতি ঃ** পর্বতশ্রেণি এলাকায় বায়ুর পরিবর্তন হওয়ার গতিপথ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

৫। **বনাঞ্চল ঃ** যেখানে যত বেশি বনাঞ্চল, সেখানে বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটে, যেমন– সুন্দরবন এলাকা, সিলেট ও ভাওয়াল গড় এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত★

নিম্নে বিভিন্ন ঋতুতে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হলো–

১। গ্রীষ্মকাল ঃ বৃষ্টিপাত 20 – 90 cm
তাপমাত্রা 19°C – 40°C

২। বর্ষাকাল ঃ বৃষ্টিপাত 90 – 280 cm
তাপমাত্রা 26°C – 39°C

৩। শরৎকাল ঃ বৃষ্টিপাত 10 – 30 cm
তাপমাত্রা 18°C – 39°C

৪। শীতকাল ঃ গড় তাপমাত্রা 13°C

বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত ঃ

বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত তিনটি; যথা–

১। পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়া

২। জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে বায়ু সম্পৃক্ত হওয়া

৩। সম্পৃক্ত বায়ু শীতল হওয়া।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৭

স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. স্ট্রিম প্রবাহ কি?

২. স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা

৩. স্টেজের পরিমাপ

৪. স্ট্রিম গেজিং সাইট নির্বাচন

৫. স্ট্রিম প্রবাহের একক

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★স্ট্রিম প্রবাহ কি?★

স্ট্রিম প্রবাহ বলতে একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম স্রোত চ্যানেলের মধ্যে পানির চলাচলকে বোঝায়, যেমন- একটি নদী, খাল বা চ্যানেল।এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চ্যানেলের একটি নির্দিষ্ট ক্রস-সেকশনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পানির পরিমাণকে বোঝায়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা★

১. কারেন্ট মিটার
২. অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার
৩. স্টেজ গেজ
৪. উইয়ারস
৫. ফ্লুমস
৬. পিটট টিউব
৭. আল্ট্রা সাউন্ড
৮. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটার
৯. প্রেসার ট্রান্সডিউসার
১০. স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★স্টেজের পরিমাপ★

১. স্টাফ গেজ
২. স্বয়ংক্রিয় পানিস্তর সেন্সর
৩. প্রেসার সেন্সর
৪. অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার
৫. ফ্লুট ও টেপ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★স্ট্রিম গেজিং সাইট নির্বাচন★

১. উদ্দেশ্য
২. হাইড্রোলজিক্যাল কনসিডারেশন
৩. এ্যাক্সেস যোগ্যতা
৪. প্রতিনিধি অবস্থান
৫. টপোগ্রাফি ও চ্যানেল জ্যামিতি
৬. চরম অবস্থানগুলো এড়িয়ে চলা
৭. নিরাপত্তা
৮. সহযোগিতা
৯. তথ্যের প্রয়োজনীয়তা
১০. ঐতিহাসিক তথ্য

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★স্ট্রিম প্রবাহের একক★

স্ট্রিম প্রবাহ, যা একটি নদী বা স্রোতের পানির প্রবাহকে বুঝায়। বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও প্রথার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ইউনিট ব্যবহার করে স্ট্রিম প্রবাহের একক পরিমাপ করা হয়। নিচে স্ট্রিম প্রবাহের কিছু সাধারণ একক দেয়া হলো–

১। কিউবিক ফিট প্রতি সেকেন্ড (Cubic feet per second – CFS) ঃ এটি স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বহুল ব্যবহৃত একক। এটি এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনফুটে পরিমাপ করা হয়।

২। প্রতি সেকেন্ডে কিউবিক মিটার (সেমি) (Cubic meters per second – CMS) ঃ এই একক সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনমিটারে পরিমাপ করা হয়।

৩। গ্যালন প্রতি মিনিট (জিপিএম) (Gallons per minute – GPM) ঃ এই এককটি ছোট প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে আবাসিক বা ছোট আকারের ক্ষেত্রে। এটি গ্যালনে পরিমাপ করা এক মিনিটে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়।

৪। প্রতি সেকেন্ডে লিটার (Liters per second (l/s)) ঃ এই এককটি কিছু দেশে ব্যবহৃত হয় এবং এটি লিটারে পরিমাপ করা এক সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়।

৫। প্রতিদিন মিলিয়ন গ্যালন (Million gallons per day – MGD) ঃ এই এককটি প্রায়শই বেশি প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায়। এটি একদিনে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়, যা মিলিয়ন গ্যালনে পরিমাপ করা হয়।

স্ট্রিম ফ্লো ডাটার সাথে কাজ করার সময় এককগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং সঠিক পরিমাপ এবং হিসাব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলে এককগুলোর মধ্যে রূপান্তর করা অপরিহার্য।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৮

বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. সংজ্ঞা

২. বাষ্পীভবনের প্রভাবক

৩. প্রস্বেদনের প্রভাবক

৪. বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাবক

৫. বাষ্পীয় প্রস্বেদন পরিমাপ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★সংজ্ঞা★

বাষ্পীভবন (Evaporation) ঃ ভূপৃষ্ঠস্থ সকল উৎস এবং উদ্ভিদ হতে পানি সৌরতাপে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তনকে বাষ্পীভবন বলে। এই বাষ্পীভূত পানি ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে প্রথমে মেঘমালা সৃষ্টি করে। পরে আরো ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। পানির বাষ্পীভবনের পরিমাণ পানিতলের উপর আরোপিত বাষ্পের তাপ এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

উর্ধ্বপাতন (Sublimation) ঃ পানি হলো তরল পদার্থ। পানির কঠিন রূপ (বরফ) হতে সরাসরি গ্যাসীয় রূপে (বাষ্প) পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন (Sublimation) বলে।

প্রস্বেদন (Transpiration) ঃ উদ্ভিদ জগত শিকড়ের সাহায্যে তরল পানি গ্রহণ করে খাদ্য প্রস্তুতে ব্যয়িত প্রয়োজনীয় অংশ বাদে গৃহীত অতিরিক্ত পানি পাতার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের সাহায্যে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে। উদ্ভিদ তরল পানি গ্রহণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন (Transpiration) বলা হয়।

বাষ্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration) ঃ বাষ্পীয় প্রস্বেদন বলতে আমরা বুঝি শস্যের জন্য সেচকৃত পানির বাষ্পীভবন এবং শস্য কর্তৃক প্রস্বেদনের মাধ্যমে নির্গত হওয়া মোট পানির অপচয়। একে সাধারণত ET দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাষ্পীভবনের প্রভাবক★

১. পানির গুণাগুণ
২. পানিপৃষ্ঠের বিস্তৃতি
৩. বিকিরণ
৪. বায়ুপ্রবাহ
৫. তাপমাত্রা
৬. বায়ুরচাপ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★প্রস্বেদনের প্রভাবক★

১. জলবায়ুর উপাদান
২. উদ্ভিদের উপাদান
৩. মৃত্তিকার উপাদান

★বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাবক★

১. তাপমাত্রা
২. সূর্যালোক
৩. বাতাসের বেগ
৪. বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা
৫. উদ্ভিদের শ্রেণি

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাষ্পীয় প্রস্বেদন পরিমাপ★

১. মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পরীক্ষা
২. ভূমির প্লট পরীক্ষা
৩. লাইসিমিটার পদ্ধতি
৪. পানি বাজেট পদ্ধতি

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-৯

অনুস্রবণ

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. সংজ্ঞা

২. অনুস্রবণ ক্ষমতার প্রভাবক

৩. হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ

৪. অনুপ্রবেশের সমীকরণ

৫. অনুপ্রবেশ সূচক

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★সংজ্ঞা★

বৃষ্টিপাত বা অন্য কোনো পানিতে মৃত্তিকার উপরের স্তর সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরের ভূনিম্নস্থ পানি তলের দিকে ধাবিত হয়, একে অনুস্রবণ বলা হয়ে থাকে।

★অনুস্রবণ ক্ষমতার প্রভাবক★

মৃত্তিকার অনুস্রবণের হার– (i) মৃত্তিকার কণাসমূহের মধ্যস্থিত ফাঁক ও ফাঁকের আকার, (ii) বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও বৃষ্টিপাতের সময়কাল, (iii) আবহাওয়া ও তাপমাত্রা, (iv) ভূপ্রকৃতি, (v) মাটির আর্দ্রতার মাত্রা, (vi) ভূনিম্নস্থ পানিতলের গভীরতা ও মৃত্তিকার দৃঢ়বদ্ধতার মাত্রার (Degree of compaction) উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কাজেই বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় অনুস্রবণের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো মৃত্তিকার স্তরে সর্বাধিক যে হারে অনুস্রবণ হয়, তাকে ঐ পরিস্থিতিতে ঐ মৃত্তিকার অনুস্রবণ ক্ষমতা (Infiltration capacity) বলা হয়। যখন বৃষ্টিপাতের তীব্রতা অনুস্রবণ ক্ষমতার অধিক হয়, তখনই অনুস্রবণ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হতে পারে। যখন বৃষ্টিপাতের তীব্রতা অনুস্রবণ ক্ষমতার কম হয়, তখন অনুস্রবণের হার প্রায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার সমান বা খানিকটা কম হয়। অনুস্রবণ ক্ষমতার তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হলে ভূপৃষ্ঠে পানি সঞ্চিত হয়। বৃষ্টিপাতের সময়কালের উপরও অনুস্রবণের মাত্রা নির্ভর করে। মৃত্তিকায় অনুস্রবণের হার মোটামুটি ঘণ্টায় 0.25 সেন্টিমিটার হতে 2.5 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুস্রবণ ক্ষমতার প্রভাবক★

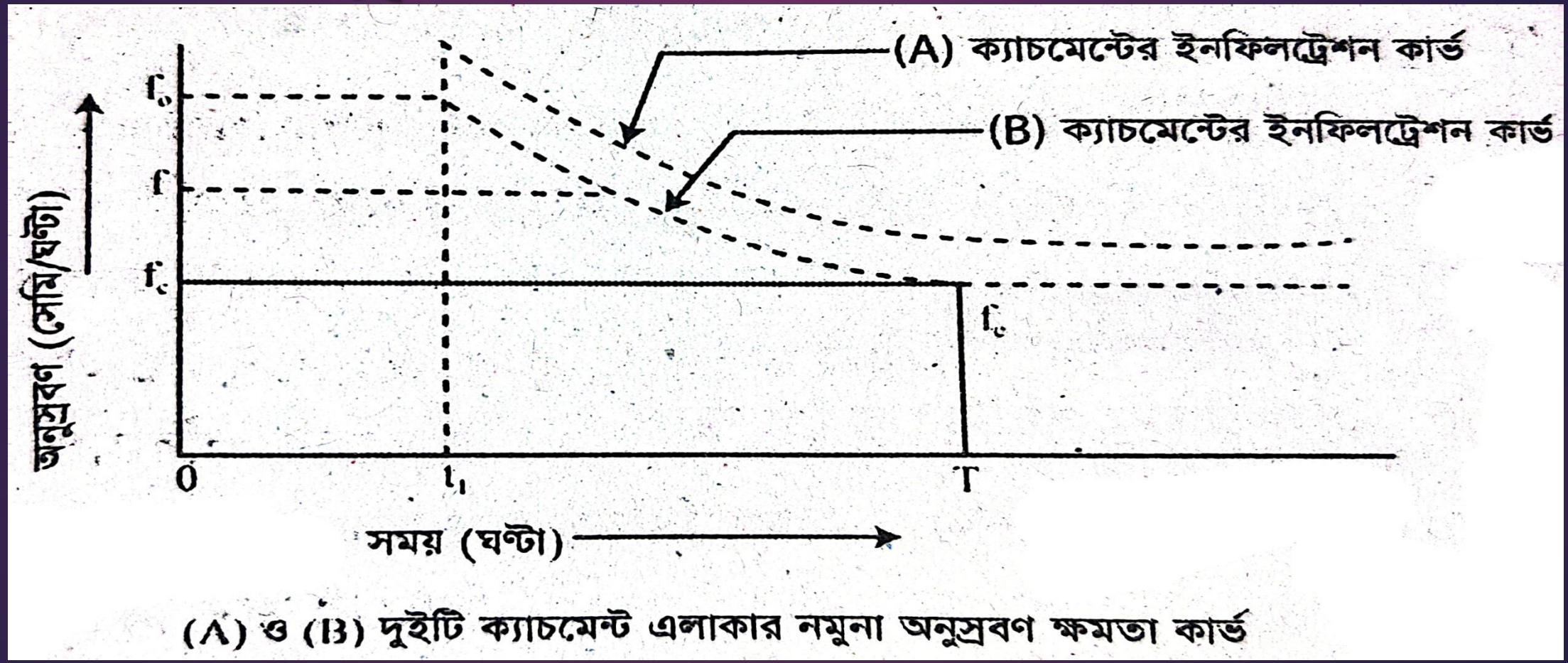

(A) ও (B) দুইটি ক্যাচমেন্ট এলাকার নমুনা অনুস্রবণ ক্ষমতা কার্ভ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুস্রবণ ক্ষমতার প্রভাবক★

সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অনুস্রবণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে–

১। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে (Experimental method)

(i) ইনফিলট্রোমিটারের সাহায্যে (টিউব ইনফিলট্রোমিটার বা ডাবল রিং ইনফিলট্রোমিটার ব্যবহার করে)

(ii) রেইন সিমুলেটর-এর সাহায্যে।

২। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে (Analyzing method)– রেইনফল হাইড্রোগ্রাফ এবং রানঅফ হাইড্রোগ্রাফ-এর সাহায্যে।

৩। অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিতে (Experiencing method)

(i) ছোট পরিসরের ড্রেনেজ বেসিনের জন্য হরনার ও লাইয়ড-এর পদ্ধতির সাহায্যে (For small drainage basins Horner and Liyod's method)

(ii) বৃহৎ পরিসরের ড্রেনেজ বেসিনের জন্য হর্টনস্ পদ্ধতির সাহায্যে (For large drainage basins, Horton's method)।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ★

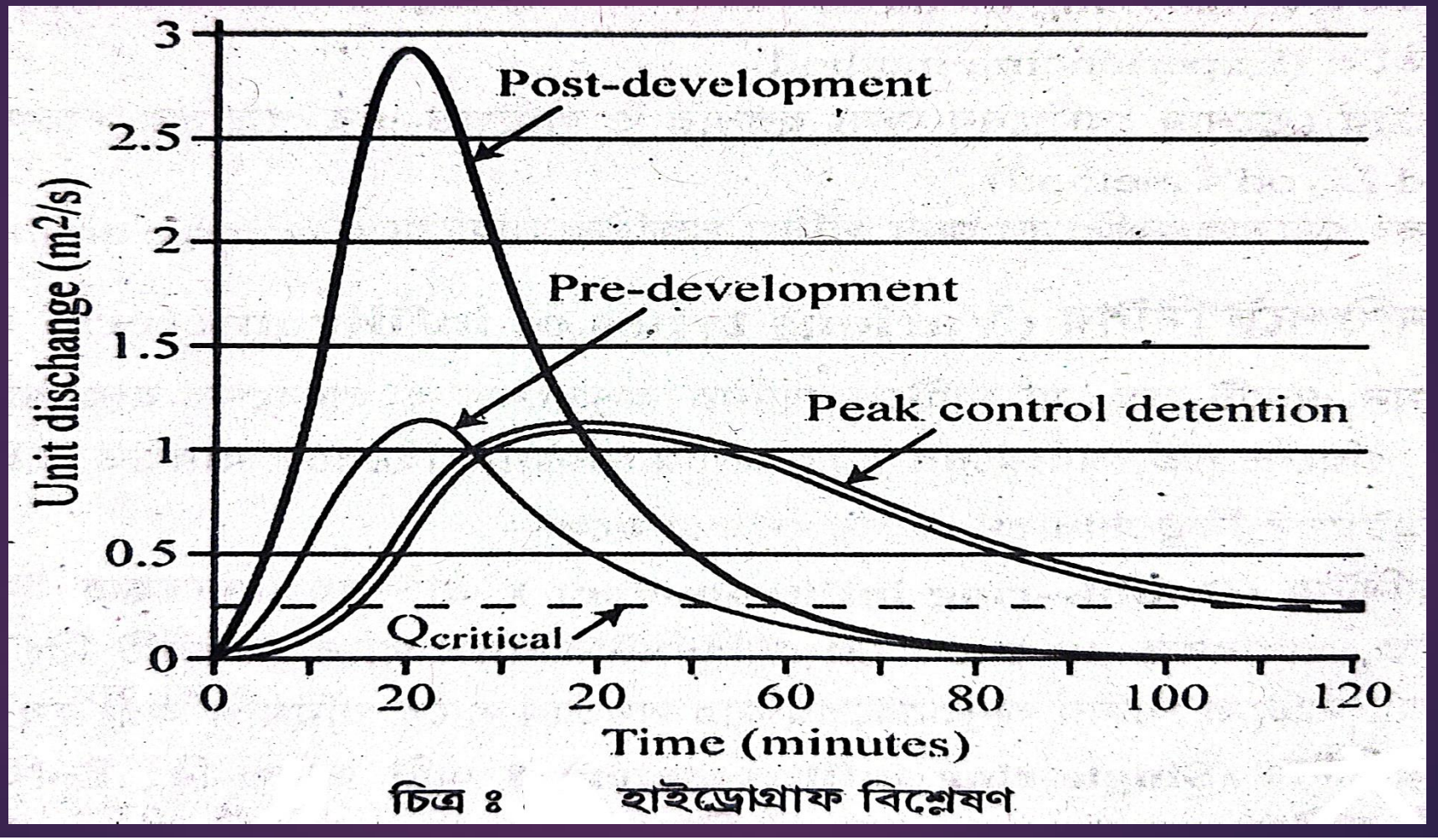

চিত্র ঃ হাইড্রোগাফ বিশ্লেষণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ★

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্যঃ-

১. বন্যা বিশ্লেষণ
২. বেইস ফ্লো সেপারেশন
৩. রেইনফল রানঅফ মডেলিং
৪. ওয়াটারশেডের বৈশিষ্ট্য
৫. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ★

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণের মূল উপাদানঃ-

১. বৃষ্টিপাতের তথ্য
২. স্ট্রিম ফ্লো ডাটা
৩. ঝড়ের ঘটনা শনাক্তকরণ
৪. হাইড্রোগ্রাফ সেপারেশন
৫. পিক ফ্লো অ্যানালাইসিস
৬. মন্দা বিশ্লেষণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুপ্রবেশের সমীকরণ★

অনুপ্রবেশ সমীকরণগুলো হলো গাণিতিক মডেল, যা মাটির পৃষ্ঠে পানি প্রবেশের প্রক্রিয়া অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়, যা অনুপ্রবেশ নামে পরিচিত। যখন বৃষ্টির পানি বা সেচ মাটিতে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা সবই মাটিতে প্রবেশ করে না; কিছু ভূপৃষ্ঠের জলাবদ্ধতার মাধ্যমে হারিয়ে যায়, বাকিগুলো মাটিতে অনুপ্রবেশ করে।

অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া মাটির ধরন, মাটির প্রাথমিক আর্দ্রতা, ঢাল, গাছপালার আবরণ এবং বৃষ্টিপাতের তীব্রতাসহ বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন অনুপ্রবেশ সমীকরণ এ জটিলতাগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং যে হারে পানি মাটিতে চলে যায় তার অনুমান প্রদান করা হয়েছে।

সবচেয়ে সুপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত অনুপ্রবেশ সমীকরণগুলোর মধ্যে একটি হলো হার্টনের অনুপ্রবেশ সমীকরণ, যা ১৯৩৩ সালে রবার্ট বি. হার্টন প্রণয়ন করেছিলেন। সমীকরণটি নিম্নরূপ–

$$f = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$$

এখানে, $k = \frac{f_0 - f_c}{F_c}$

f_0 = প্রাথমিক অনুপ্রবেশ ক্ষমতার হার।

f_c = সম্পৃক্ত অবস্থায় ধ্রুবক বা স্থির অনুপ্রবেশের হার।

e = নেপিরিয়ান লগারিদমের বেস (ভিত্তি)।

k = একটি ধ্রুবক যা প্রাথমিকভাবে মাটি এবং খড়কুটা, ঝোপঝাড়ের উপর নির্ভরশীল।

t = বৃষ্টিপাতের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়।

হার্টনের সমীকরণ অনুমান করে যে অনুপ্রবেশের হার সময়ের সাথে সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়, যতক্ষণ না এটি চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ক্ষমতায় পৌঁছায়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুপ্রবেশের সমীকরণ★

আরেকটি বহুল ব্যবহৃত অনুপ্রবেশ সমীকরণ হলো গ্রিন-অ্যাম্পট সমীকরণ, যা মাটিতে প্রাথমিক পানির পরিমাণ বিবেচনা করে। এটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয়–

$$I = (K_s + \psi_m) * t + (\psi_i - \psi_m) * \log((K_s + \psi_i * t) / (K_s + \psi_m))$$

যেখানে (Where) ঃ

⇒ I = ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ (প্রতি ইউনিট এলাকায় পানি গভীরতা) সময় টি

⇒ K_s হলো মাটির স্যাচুরেটড হাইড্রোলিক পরিবাহিতা

⇒ ψ_m হলো ভেজা সামনের মাটির কৈশিকটান

⇒ ψ_i হলো প্রাথমিক মাটির কৈশিক Suction সময় $t = 0$।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুপ্রবেশ সূচক★

অনুপ্রবেশ সূচকগুলো মাটির উপরিভাগে পানি (বৃষ্টি বা সেচ) শোষণ করার ও মাটির প্রোফাইলের মাধ্যমে এটিকে ছিদ্র করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মাটির ক্ষমতা পরিমাপ করতে এবং মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এ সূচকগুলো মাটির মধ্যে পানির গতিবিধি এবং উদ্ভিদের শিকড় ও ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জের জন্য এর প্রাপ্যতা বুঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সাধারণত জলবিদ্যা, কৃষি এবং পরিবেশগত গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। নিম্নে কিছু সাধারণ অনুপ্রবেশ সূচক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১। **অনুপ্রবেশের হার (Infiltration rate)** ঃ অনুপ্রবেশের হার প্রতি একক এলাকায় মাটির পৃষ্ঠে পানি প্রবেশ করার গতিকে বুঝায়। এটি সাধারণত মিলিমিটার প্রতি ঘণ্টায় (মিমি/ঘণ্টা) বা ইঞ্চি প্রতি ঘণ্টায় (in/ hr) প্রকাশ করা হয়। মাটির উপরিভাগে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি প্রয়োগ করে এবং মাটিতে পানির অনুপ্রবেশের জন্য যে সময় লাগে তা পর্যবেক্ষণ করে পরিমাপ করা হয়।

২। **ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ (Cumulative infiltration)** ঃ ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাটিতে অনুপ্রবেশ করা পানির মোট গভীরতা। এটি সময়ের সাপেক্ষে অনুপ্রবেশের হারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মিলিমিটার (মিমি) বা ইঞ্চি-এর মতো এককে প্রকাশ করা হয়।

৩। **অনুপ্রবেশ ক্ষমতা (Infiltration capacity)** ঃ অনুপ্রবেশ ক্ষমতা বলতে বুঝায় যে সর্বোচ্চ হারে মাটি নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে পানি শোষণ করতে পারে; যেমন– মাটির আর্দ্রতা, পৃষ্ঠের ঢাল এবং প্রাথমিক অনুপ্রবেশের হার। এটি মাটির ধরন, গাছপালার আবরণ এবং পূর্ববর্তী মাটির আর্দ্রতার কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★অনুপ্রবেশ সূচক★

৪। **স্টেডি-স্টেট অনুপ্রবেশের হার (Steady-state infiltration rate) ঃ** অবিচলিত অবস্থায় অনুপ্রবেশের হার হলো একটি দীর্ঘ সময়ের একটানা বৃষ্টিপাত বা সেচের পরে অর্জিত অনুপ্রবেশের হার, যেখানে হার তুলনামূলকভাবে স্থির হয়ে যায়। মাটিতে দীর্ঘমেয়াদি পানি প্রবেশের বিষয়টি বুঝার জন্য এটি একটি কার্যকর পরিমাপ পদ্ধতি।

৫। **অনুপ্রবেশের অতিরিক্ত (হর্টোনিয়ান ওভারল্যান্ড ফ্লো) (Infiltration excess (Hortonian overland flow)) ঃ** এ সূচকটি এমন পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক, যেখানে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা মাটির অনুপ্রবেশের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে পৃষ্ঠে অতিরিক্ত পানি জমে থাকে এবং প্রবাহের কারণ হয়।

৬। **ফিলিপ-এর অনুপ্রবেশ মডেল (Philip's infiltration model) ঃ** এ মডেলটি সময়ের বর্গমূল্যের একটি ফাংশন হিসাবে সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশকে বর্ণনা করে। এটি প্রাথমিক অনুপ্রবেশের হার এবং মাটির আর্দ্রতা হ্রাসের কারণে সময়ের সাথে সাথে অনুপ্রবেশের হ্রাস উভয়ই বিবেচনা করে।

৭। **গ্রিন-অ্যাম্পট মডেল (Green-Ampt model) ঃ** গ্রিন-অ্যাম্পট মডেলটি প্রাথমিকভাবে শুষ্ক মাটিতে অনুপ্রবেশ অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়। এটি অনুপ্রবেশের হার নির্ধারণ করতে মাটির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ করা হাইড্রোলিক হেড বিবেচনা করে।

৮। **কোস্টিয়াকভ অনুপ্রবেশ মডেল (Kostiakov infiltration model) ঃ** এ অভিজ্ঞতামূলক মডেলটি সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশকে সম্পর্কিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে অনুপ্রবেশের হার কীভাবে হ্রাস পায় তা উপস্থাপন করে।

অনুপ্রবেশ সূচকগুলো মাটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা, বন্যার পূর্বাভাস এবং মাটির প্রোফাইলের মাধ্যমে গতিবিধি নির্ণয় করা যায়। উপযুক্ত সেচ পদ্ধতি নির্ধারণে, বন্যার পানি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা ডিজাইন করতে এবং জলবিদ্যুৎ প্রক্রিয়ায় ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তিত প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তা করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১০

বৃষ্টিপাত এবং রানঅফ সম্পর্ক

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. "রানঅফ" এর সংঙ্গা

২. রানঅফকে প্রভাবিত করার কারণ

৩. ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক রানঅফ নির্ণয়করণ

৪. গাণিতিক সমস্যাবলি

৫. "রানঅফ" এর অঙ্গসমূহ

৬. ভূপৃষ্ঠ রানঅফ

৭. বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্ক

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★"রানঅফ" এর সংজ্ঞা★

বৃষ্টিপাতের পর কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে ঐ স্রোতস্বিনীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, ঐ পরিমাণ পানিকেই উক্ত এলাকার ক্যাচমেন্ট এলাকার **"রানঅফ"** বলা হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★রানঅফকে প্রভাবিত করার কারণ★

অনন্তকাল ধরে পানিচক্র (Hydrologic cycle) পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। আর এ পানিচক্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো রানঅফ চক্র (Runoff cycle)। বায়ুমণ্ডল হতে ভূভাগে পতিত অধঃক্ষেপণ (Precipitation) ও পরবর্তীতে বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর মাধ্যমে এর ক্ষরণ (discharge), বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন ও বাষ্পী-প্রস্বেদনে এর বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়া পানিচক্রের অংশই রানঅফ চক্র (Runoff cycle)।

যেহেতু 'রানঅফ'-এর সাথে অধঃক্ষেপণ ও স্থল ভাগ সম্পর্কিত। তাই বৃহত্তর আওতার বিচেনায় 'রানঅফ'-এ প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (i) অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্যাদি ও (ii) স্থল ভাগের অর্থাৎ ড্রেনেজ বেসিন বা ক্যাচমেন্টের বৈশিষ্ট্যাদি।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★রানঅফকে প্রভাবিত করার কারণ★

(ক) অধঃক্ষেপণ বৈশিষ্ট্যাদি (Characteristics of precipitation) ঃ

(i) অধঃক্ষেপণের ধরন (Types of precipitation)

(ii) বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (Rain intensity)

(iii) বৃষ্টিপাতের স্থিতিকাল (Duration of rainfall)

(iv) বৃষ্টিপাতের এলাকায় এর বিভাজন (Areal rainfall distribution)

(v) ভারী বর্ষণের দিক (Direction of prevailing storm)

(vi) অন্যান্য জলবায়ু সংক্রান্ত অবস্থা (Other climatic conditions)।

(খ) ক্যাচমেন্ট এলাকা বা ড্রেনেজ বেসিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of catchments or drainage basin)

(i) ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার-আকৃতি ও অবস্থান (Shape, size & location of catchment)

(ii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূসংস্থানিক অবস্থা (Topography of catchment)

(iii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Geological characteristics of catchment)

(iv) ক্যাচমেন্টের মৃত্তিকায় আর্দ্রতা স্বল্পতা (Soil moisture deficiency of catchment)

(v) ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়া সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্য (Meteorological characteristics of catchment)

(vi) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূপৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the catchment surface)

(vii) ক্যাচমেন্ট এলাকার জলাধার সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য (Storage characteristics of catchment)।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক রানঅফ নির্ণয়করণ★

বারিবর্ষণের সাথে সাথে প্রথমেই বৃষ্টির পানি (P) বিভিন্ন প্রতিরোধক (গাছগাছড়া, শুকনা পাতা, ঘাস, বাড়িঘর ইত্যাদি) সিক্ত করতে (P_i) ব্যবহৃত হয়। তারপর অবশিষ্ট পানি ভূপৃষ্ঠের ছোট ছোট নিচু অংশে জমা (S_d) হয় এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস (Soil moisture deficiency) পূরণে সক্রিয় হয়। এসব পানির পরিমাণকে ($P_i + S_d$ + মৃত্তিকা আর্দ্রতা হ্রাসের পূরণে ব্যয়িত পানি) ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (Initial basin recharge = L) বলা হয়। ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (L) অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হলে ভূত্বকের নিম্নস্তরে পানির প্রবেশ ও অনুস্রাবণ (G) ঘটবে এবং অতিরিক্ত পানি ($R = P - L - G$) রানঅফ (R) হিসেবে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে।

অতএব রানঅফ, $R = P - L - G$

এটাই রানঅফ নির্ণয়ের মূল সূত্র। কিন্তু উপরোক্ত (L) ও (G) এর মান বহুসংখ্যক জটিল শর্তের উপর নির্ভরশীল। তাই এগুলোর মান নির্ণয়করণ সহজসাধ্য নয় বিধায়–

(ক) বৃষ্টিপাতের তথ্য ও ধরাকৃত রানঅফ সহগ ব্যবহার করে,

(খ) স্রোতস্বিনী বা নদীর গেজ পাঠ ব্যবহার করে ও

(গ) অভিজ্ঞতালব্ধ রানঅফ সূত্র ব্যবহার করে গড় বার্ষিক রানঅফ নির্ণয় করা হয়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★গাণিতিক সমস্যাবলি★

উদাহরণ-২। মালভূমিতে স্থাপিত বৃষ্টিমান যন্ত্রের লিপিবদ্ধকৃত তথ্য হতে 35 বছরে মোট 7000 cm বৃষ্টিপাত পাওয়া গেল। উক্ত মালভূমিতে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ কত হবে? [বাকাশিবো-২০০৯]

সমাধান: মালভূমির জন্য $k = 0.7$ (ছক-১ হতে)

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত $P = \frac{7000}{35} = 200$ সেমি

$\therefore$ গড় বার্ষিক রানঅফ $R = 0.7 \times 200 = 140$ সেমি **(উত্তর)**

উদাহরণ-৪। সুদীর্ঘ সময়ে 2000 হেক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার খালে ক্ষরণের তথ্যাদি হতে প্রাপ্ত গড় ক্ষরণের পরিমাণ 1 মিটার^3/সেঃ পাওয়া গেল। যদি উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 200 সেমি হয়, তবে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ ও রানঅফ সহগ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০১৮(পরি)]

সমাধান: গড় বার্ষিক ক্ষরণের আয়তন, $V = 1 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31536000$ মিটার^3

ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল, $A = 2000 \times 10^4$ মিটার^2

অতএব গড় বার্ষিক রানঅফ, $R = \frac{V}{A} = \frac{31536000}{2000 \times 10^4} = 1.5768$ মিটার $= 157.68$ সেমি

রানঅফ সহগ, $K = \frac{R}{P}$

$= \frac{157.68}{200} = 0.7884$ **(উত্তর)**

★গাণিতিক সমস্যাবলি★

উদাহরণ-৮। পার্বতীপুরের একটি ক্যাচমেন্ট এলাকায় গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 2000 মিমি এবং উক্ত অঞ্চলের বাৎসরিক তাপমাত্রার গড় 30° সেন্টিগ্রেড হলে উক্ত অঞ্চলে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০০৭]

সমাধান ঃ এ.এন. খোসলার সূত্র ব্যবহার করে–

গড় বার্ষিক রানঅফ, $R = \left(P - \frac{t}{2.12}\right)$

$= 200 - \frac{30}{2.12} = 185.85$ সেমি **(উত্তর)**

দেয়া আছে,

$P = 2000$ মিমি $= 200$ সেমি

$t = 30°$

উদাহরণ-৯। 5000 হেক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ক্যাচমেন্ট এলাকার স্রোতস্বিনীতে গড়ে প্রবাহের পরিমাণ 1500 লিটার/সেকেন্ড এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 100 সেমি হলে গড় বার্ষিক রানঅফ ও রানঅফ সহগ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০০৪]

সমাধান ঃ গড় বার্ষিক প্রবাহের আয়তন $= 365 \times 24 \times 60 \times 60 \times \frac{1500}{1000} = 47304000$ ঘনমিটার

ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল $= 5000 \times 10^4$ বর্গমিটার

গড় বার্ষিক রানঅফ $= \frac{47304000}{5000 \times 10^4} = 0.95$ মিটার $= 95$ সেমি

রানঅফ সহগ, $K = \frac{R}{P} = \frac{95}{100} = 0.95$

উত্তর ঃ গড় বার্ষিক রানঅফ $= 95$ সেমি

রানঅফ সহগ $= 0.95$

★গাণিতিক সমস্যাবলি★

উদাহরণ-১০। দিনাজপুরের একটি ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 194 সেন্টিমিটার এবং বার্ষিক তাপমাত্রার গড় 28° সেন্টিগ্রেড হলে ঐ এলাকার গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ কত হবে? [বাকাশিবো-২০০৯]

সমাধান ঃ এ.এন. খোসলার সূত্র ব্যবহার করে–

গড় বার্ষিক রানঅফ, $R = (P - \frac{t}{2.12})$

$= (194 - \frac{28}{2.12})$

$= 180.79$ সেন্টিমিটার

দেয়া আছে,

$P = 194$ সেমি

$t = 28°$ সেন্টিগ্রেড

উত্তর ঃ 180.79 সেন্টিমিটার।

★"রানঅফ" এর অঙ্গসমূহ★

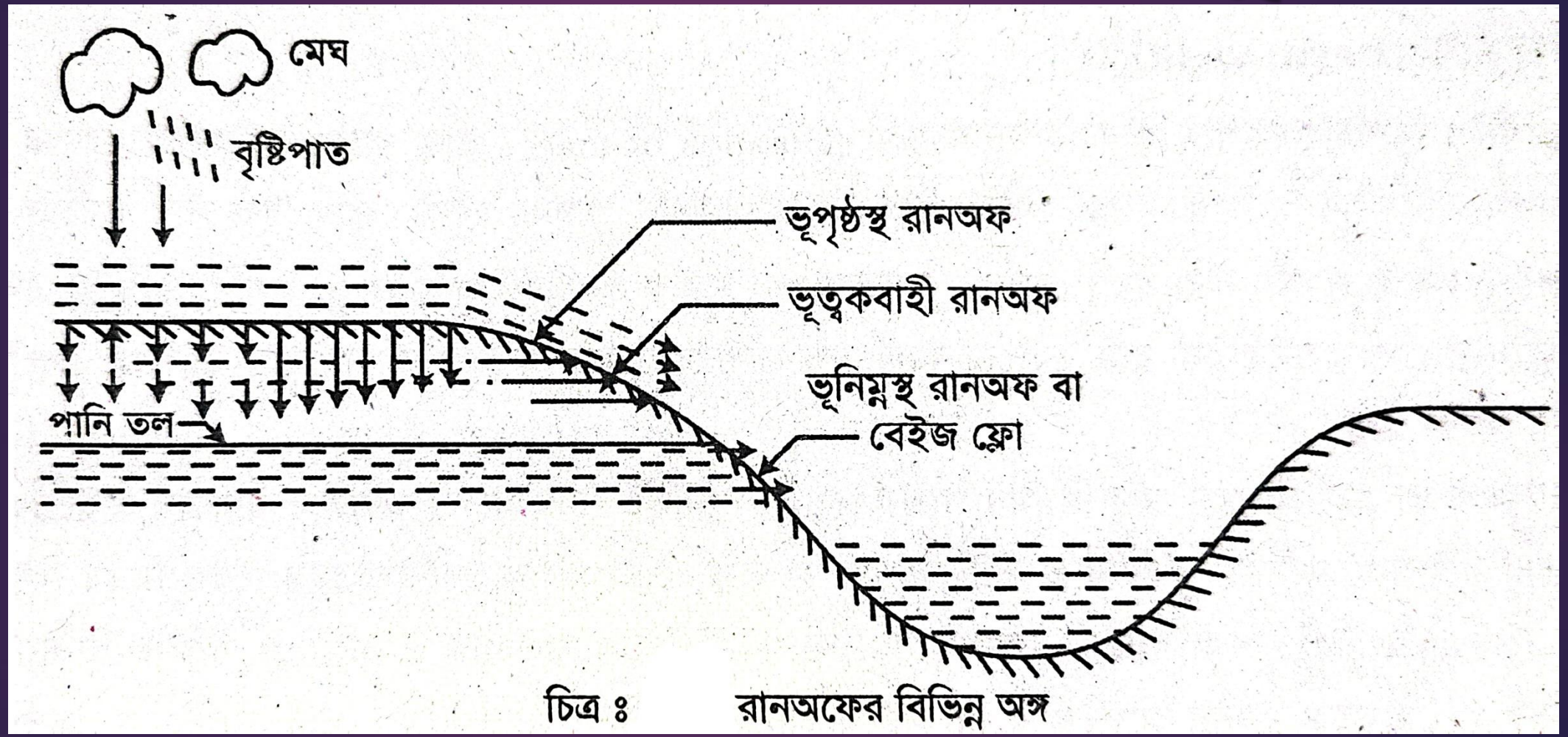

চিত্র ঃ রানঅফের বিভিন্ন অঙ্গ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★ভূপৃষ্ঠ রানঅফ★

কোনো স্রোতস্বিনীতে (খাল, জলাধার, নদী ইত্যাদি) যেটুকু এলাকার পানি আসে, সেটুকু এলাকাকে ঐ স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা বলা হয়। বৃষ্টিপাতের পর কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে ঐ স্রোতস্বিনীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, সাধারণভাবে ঐ পরিমাণ পানিকে উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ (Runoff) বলা হয়। কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকায় বৃষ্টিপাতের পর ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাচমেন্ট এলাকার স্রোতস্বিনীতে পতিত হয়। এ পানিকে ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফ (Surface runoff) বলা হয়। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার মৃত্তিকা পানি প্রবেশ্য হলে ভূত্বক সম্পৃক্ত হওয়ার পর যে পরিমাণ পানি ভূনিম্নস্থ পানিতলে না পৌঁছে ভূত্বক ও তৎসংলগ্ন মৃত্তিকার মাধ্যমে স্রোতস্বিনীতে পতিত হয়, তাকে ভূত্বকবাহী প্রবাহ (Inter flow) বা ভূত্বকবাহী রানঅফ বলা হয়।

এ ভূত্বকবাহী প্রবাহকে ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফ হিসেবে ধরা হয়। অপরদিকে, বৃষ্টিপাতের পানির কিছু অংশ মৃত্তিকাস্তরের গভীরে প্রবেশ করে ভূনিম্নস্থ প্রবাহের (Groundwater flow) মাধ্যমে স্রোতস্বিনীতে পতিত হয়। এটি ভূনিম্নস্থ রানঅফ হিসেবে পরিচিত। মূলত (১) ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফ, (২) ভূনিম্নস্থ রানঅফ ও (৩) স্রোতস্বিনী ইত্যাদিতে পতিত বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ রানঅফ হিসেবে বিবেচিত হয় (চিত্র ঃ ১০.৩)।

উপরোক্ত প্রথম রানঅফ সর্বাধিক প্রবাহ সৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় রানঅফটি ন্যূনতম প্রবাহের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। শেষোক্তটি সাধারণত বিবেচনায় আনা হয় না। তবে সচরাচর ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফকেই রানঅফ হিসেবে ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভূত্বকবাহী প্রবাহের জন্য ভূত্বকের নিম্নস্থ মৃত্তিকা পানি অপ্রবেশ্য (Impermeable) বা উপরস্থ স্তরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রবেশ্য হওয়া আবশ্যক।

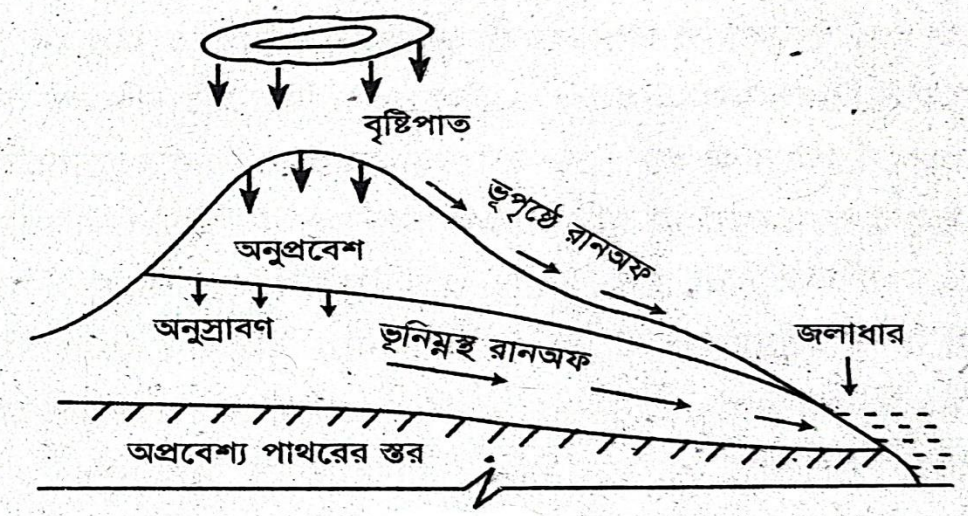

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্ক★

কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ডিজাইন ও পানি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাধারণত বিভিন্ন ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের দীর্ঘ সময়ের রেকর্ড পাওয়া সহজ। তাই কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ জানা থাকলে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হতে সহজেই রানঅফের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এবং মূল প্রবণতা ও প্রাপ্ত তথ্যাদির বিচারবিবেচনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এগুলোর বহির্ভূত তথ্যাদি সংযোগকরণে ও তথ্যাদির প্রক্ষেপণে সহায়ক হয়। যে-সব ক্যাচমেন্ট এলাকার স্রোতস্বিনীতে পানি ক্ষরণের পরিমাণ পরিমাপের ব্যবস্থা থাকে না (Ungauged), ঐ সকল ক্যাচমেন্টের বৃষ্টিপাতের তথ্য জানা থাকলে বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্ক হতে সহজেই এর স্রোতস্বিনীতে স্রোত প্রবাহ (Stream flow) বা ক্ষরণের (Discharge) পরিমাণ বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। ক্যাচমেন্ট এলাকা, এর ভাটির অঞ্চলে বন্যার যথাযথ পূর্বাভাস প্রদানে, হাইড্রোলিক প্রজেক্ট পরিচালনায় বৃষ্টিপাত এবং রানঅফ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্টর্মের (সময় বিতরণসহ) রানআফ মাসিক, মৌসুমভিত্তিক, বছরের রানঅফ-এর পরিমাণ নির্ণয় করে জলাধারে পানি সঞ্চয়ের প্রাক্কলন, প্রকল্প পরিচালন ও মূল্যায়নে ক্যাচমেন্টের বৃষ্টিপাত এবং রানঅফ সম্পর্কই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। তাই সকল হাইড্রোলজিস্ট-এর জন্য একক হাইড্রোগ্রাফ, সময় বিতরণসহ বৃষ্টিপাত, রানঅফ ইত্যাদি পানি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণে বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্ক★

ক্যাচমেন্টের ভিন্নতায় বৃষ্টিপাত রানঅফ-এর সম্পর্কের ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। ক্যাচমেন্টের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতায় সমতীব্রতা ও ব্যাপ্তির (Intensity & Duration) একটি স্ট্রমের বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ভিন্ন ধরনের ক্যাচমেন্টে দীর্ঘ সময়ে বৃষ্টিপাত ও রানঅফ-এর পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকৌশল ও হাইড্রোলজিস্টগণ সমশ্রেণির ক্যাচমেন্ট ও বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যাদির উপর বিচার-বিশ্লেষণ করে বৃষ্টিপাত রানআফ সম্পর্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রদান করেন।

নিচে বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্কের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতির নাম দেওয়া হলো–

(ক) কোঅ্যাক্সিয়াল গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি (Coaxiaol graphical method)

(খ) ইনফিল্ট্রেশন পদ্ধতি (Infiltation mehtod)

(গ) স্ট্রেনজস টেবিল অ্যান্ড কার্ভ (Strange's table & curves)

(ঘ) ইংলিজ ফর্মুলা (Inglis formula)

(ঙ) বেননাই পদ্ধতি (Binnie method)

(চ) বারলো'স টেবিল (Barlow's table)।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১১
হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. কতিপয় কিছু সংজ্ঞা

২. হাইড্রোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য

৩. হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্ব

৪. একক হাইড্রোগ্রাফের প্রয়োগ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★কতিপয় কিছু সংজ্ঞা★

একক হাইড্রোগ্রাফঃ কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকায় সমতলে, সমহারে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কার্যকরি বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে উক্ত ক্যাচমেন্টের স্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাই ঐ স্রোতস্বিনীর ঐ সেকশনের একক হাইড্রোগ্রাফ।

দুই ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফঃ দুই ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ বলতে কোনো এলাকায় সমতলে, সমহারে দুই ঘন্টা কার্যকরি বৃষ্টিপাতের ফলে এক সেন্টিমিটার প্রত্যক্ষ রানঅফকে বুঝায়।

স্ট্রর্ম হাইড্রোগ্রাফঃ কোনো স্ট্রর্মের পানি রানঅফ হিসেবে প্রবাহিত হয়ে কোনো নির্গমন পথের কোনো সেকশনে ক্ষরণের পরিমাণ ও ক্ষরণ সময়কালের সম্পর্ক দেখিয়ে যে লেখচিত্র আকা হয়, তাকে স্ট্রর্মের হাইড্রোগ্রাফ বলে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য★

(i) **সময় অক্ষ (Time axis) ঃ** অনুভূমিক অক্ষ সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে। হাইড্রোলজিক্যাল ইভেন্টের স্কেল এবং সময়কালের উপর নির্ভর করে ঘণ্টা, দিন এমনকি মাসগুলোতে প্লট করা হয়।

(ii) **ডিসচার্জ অক্ষ (Discharge axis) ঃ** উল্লম্ব অক্ষ নদী বা স্রোতের ডিসচার্জ বা প্রবাহ হারকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সাধারণত কিউবিক মিটার প্রতি সেকেন্ডে (m^3/s) বা কিউবিক ফুট প্রতি সেকেন্ডে (cfs) পরিমাপ করা হয়।

(iii) **বেসফ্লো (Baseflow) ঃ** বেসফ্লো হলো শুষ্ক সময়কালে নদী বা স্রোতে স্থায়ী প্রবাহ, যা প্রধানত ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষরণ দ্বারা সরবরাহ করা হয়। এটি হাইড্রোগ্রাফের একটি ধ্রুবক বা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত অংশ গঠন করে।

(iv) **হাইড্রোগ্রাফ পিকস (Hydrograph peaks) ঃ** হাইড্রোগ্রাফের উৎসগুলো ইভেন্টের সময় সর্বাধিক প্রবাহের হারকে উপস্থাপন করে। এগুলো তীব্র বৃষ্টিপাত বা দ্রুত তুষার গলনের মতো কারণে ঘটে।

(v) **ক্রমবর্ধমান অঙ্গ (Rising limb) ঃ** হাইড্রোগ্রাফের ক্রমবর্ধমান অঙ্গ প্রবাহ হারের দ্রুত বৃদ্ধি দেখায়, কারণ বৃষ্টিপাত নদী বা স্রোতকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এটি বৃষ্টিপাত বা তুষার গলিত ঘটনার জন্য জলধারার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

(vi) **পতিত অঙ্গ (Falling limb) ঃ** পতনের অঙ্গটি প্রবাহের হারের ক্রমশ হ্রাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ অতিরিক্ত পানি সরে যায়। কীভাবে নদী বা স্রোত তার স্বাভাবিক প্রবাহের অবস্থায় ফিরে আসে এটি তা দেখায়।

(vii) **ল্যাগ টাইম (Lag time) ঃ** ল্যাগ টাইম হলো সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত এবং নদী বা স্রোতে সর্বোচ্চ প্রবাহের হারের মধ্যে সময়ের পার্থক্য। এটি ক্যাচমেন্ট এলাকা, নিষ্কাশন বৈশিষ্ট্য এবং মাটির ধরনের মতো কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(viii) **রিসেশন লিম্ব (Recession limb) ঃ** রিসেশন লিম্ব হাইড্রোলজিক্যাল ইভেন্ট পার হওয়ার পর নদী বা স্রোতের বেসফ্লো অবস্থাতে ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন দেখায়।

(ix) **পিক ডিসচার্জ এবং মোট প্রবাহ (Peak discharge and total flow) ঃ** হাইড্রোগ্রাফগুলো হাইড্রোলজিস্টদের সর্বোচ্চ ডিসচার্জ এবং ঘটনার সময়কালের মোট প্রবাহের পরিমাণ গণনা করতে সাহায্য করে। বন্যার পূর্বাভাস, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্ব★

কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকায় সমতালে বা সমহারে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে উক্ত ক্যাচমেন্টের স্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট স্টেশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তা-ই ঐ স্রোতস্বিনীর ঐ স্টেশনের একক হাইড্রোগ্রাফ (*Unit hydrograph*)। ধরা যাক, একটি 3 ঘণ্টা একক হাইড্রোগ্রাফ। এতে বুঝানো হয় যে, কোনো এলাকায় সমতালে, সমহারে 3 ঘণ্টার কার্যকরী বৃষ্টিপাতের ফলে এক সেন্টিমিটার প্রত্যক্ষ রানঅফ পাওয়া যায়।

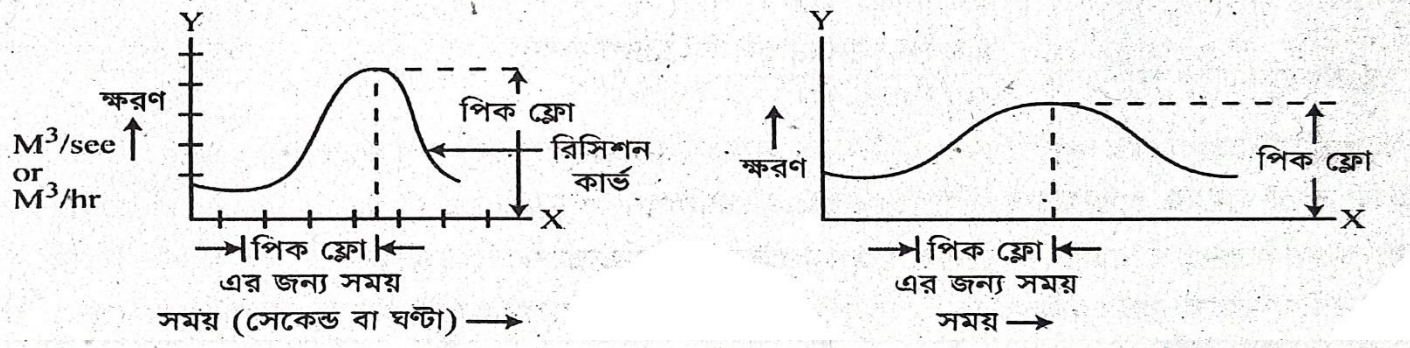

একক হাইড্রোগ্রাফের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বেসিন ল্যাগ (Baslin lag) বলা হয়–

১। বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্বকালের মধ্যে কার্যকরী বৃষ্টিপাত সকল সময়ে সমভাবে বর্ষিত হবে।

২। কার্যকরী বৃষ্টিপাত ক্যাচমেন্ট এলাকায় সর্বত্র সমভাবে বর্ষিত হবে।

৩। একক স্থায়িত্বকালের কার্যকরী বৃষ্টিপাতের প্রত্যক্ষ রানঅফের হাইড্রোগ্রাফের সময়কাল ধ্রুব হবে।

৪। প্রত্যেকটি হাইড্রোগ্রাফে উপস্থাপিত প্রত্যক্ষ রানঅফের মোট পরিমাণ সাধারণ বেইস টাইমে প্রত্যক্ষ রানঅফ হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেটগুলোর সাথে সরাসরি সমানুপাতিক হবে।

৫। কোনো স্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্টে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাতের রানঅফের হাইড্রোগ্রাফ উক্ত ক্যাচমেন্টের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যাদির প্রতিফলন ঘটায়।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★একক হাইড্রোগ্রাফের প্রয়োগ★

১. বন্যার পূর্বাভাস
২. হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের ডিজাইন
৩. শহুরে ঝড় পানির ব্যবস্থাপনা
৪. পানি সরবরাহ পরিকল্পনা
৫. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১২
ফ্লাড রাউটিং

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. সংজ্ঞা

২. ফ্লাড রাউটিংয়ের উপাদান

৩. বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ

৪. জলাধারের রাউটিং

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★সংজ্ঞা★

ফ্লাড রাউটিংঃ জলাধারের পানি সমতা, বিভিন্ন সময়ের বন্যায় এবং অতি বন্যায় জলাধারের আগত পানির হাইড্রোগ্রাফের বিপরীত জলাধারে মজুদকৃত পানি ও পানি প্রত্যাহারের হার হিসাবের প্রক্রিয়া বা কলাকৌশলই ফ্লাড রাউটিং বা রিজার্ভার রাউটিং।

★ফ্লাড রাউটিংয়ের উপাদান★

১. হাইড্রোলজিক ইনপুট
২. পৌছানোর বৈশিষ্ট্য
৩. সংরক্ষণ সমীকরণ
৪. রাউটিং উপাদান
৫. সময়ের ধাপ
৬. সীমানা শর্ত
৭. সিমুলেশন এবং বিশ্লেষণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ★

বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণের মূল উপাদানগুলো নিম্নোক্তঃ

১. তথ্য সংগ্রহ
২. হাইড্রোলিক এবং হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং
৩. ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন
৪. পরিবেশগত প্রভাব
৫. ঝুঁকি মূল্যায়ন
৬. প্রশমন ও প্রস্তুতি কৌশল
৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★জলাধারের রাউটিং★

জলাধার রাউটিং হলো একটি হাইড্রোলজিকাল ধারণা যা নদী বা স্রোত ব্যবস্থায় পানির প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং অনুকরণ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে যখন নদীর ধারে মানবসৃষ্ট জলাধার থাকে। জলাধারগুলো হলো বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়, যা পানি সরবরাহ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পানি সঞ্চয় করার জন্য নদী জুড়ে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

জলাধারের রাউটিং প্রক্রিয়াটির সাথে সম্পর্কিত কীভাবে জলাধারের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ, নিম্নধারার প্রবাহ এবং পানির স্তরকে প্রভাবিত করে। যখন বৃষ্টিপাত বা প্রবাহ জলাধারে প্রবেশ করে, তখন এটি পানির স্তর বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ, বাঁধের আউটলেটগুলোর মাধ্যমে পানি ছেড়ে দেয়। ছেড়ে আসা পানি নদী প্রণালি দিয়ে ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়।

জলাধারের রাউটিং-এর লক্ষ্য হলো জলাধারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ইনফ্লো হাইড্রোগ্রাফ কীভাবে পরিবর্তিত হবে, যার ফলে বহিঃপ্রবাহ হাইড্রোগ্রাফ হবে তা অনুমান করা। এ বিশ্লেষণটি বিভিন্ন কারণে অপরিহার্য, যেমন–

১। **বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood management) ঃ** জলাধারের রাউটিং কীভাবে ভারী বৃষ্টিপাত বা তুষার গলিত হওয়ার সময় বহিঃপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে জলাধারের ক্রিয়াকলাপগুলো নিচের দিকের বন্যাকে প্রশমিত করতে পারে তা বুঝাতে সহায়তা করে।

২। **পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (Water supply management) ঃ** ইনফ্লো এবং বহিঃপ্রবাহ হাইড্রোগ্রাফগুলো অধ্যয়ন করে, পানি পরিচালকরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন– পৌরসভার পানি সরবরাহ, কৃষি এবং শিল্পের প্রয়োজনের জন্য পানির স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে জলাধার অপারেশনগুলোকে অনুকূল করতে পারে।

৩। **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (Hydropower generation) ঃ** জলাধার রাউটিং বিদ্যুতের চাহিদা এবং পানি সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে মেলানোর জন্য পানি নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে।

৪। **পরিবেশগত প্রভাব (Environmental impact) ঃ** প্রবাহের ধরন বুঝে নিম্নধারার বাসস্থান, জলজ জীবন এবং পানির গুণমানের উপর পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১৩
ব্লু ইকোনমি

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. নীল অর্থনীতি

২. বাংলাদেশে নীল অর্থনীতির প্রধান সম্ভাবনা

৩. নীল অর্থনীতির উপাদান

৪. বাংলাদেশে ব্লু ইকোনমি প্রচার নীতি

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★নীল অর্থনীতি★

১। **মৎস্য ও জলজ চাষ (Fisheries and aquaculture) ঃ** সামুদ্রিক জলজ সম্পদ সংগ্রহ ও চাষাবাদ।

২। **পর্যটন (Tourism) ঃ** উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটন গন্তব্যের উন্নয়ন এবং প্রচার।

৩। **সামুদ্রিক শিপিং (Marine shipping) ঃ** সমুদ্রপথে পণ্য এবং মানুষের পরিবহন।

৪। **অফশোর এনার্জি (Offshore energy) ঃ** সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য শক্তির সম্পদ আহরণ।

৫। **উপকূলীয় সুরক্ষা (Coastal protection) ঃ** জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৬। **সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি (Marine biotechnology) ঃ** নতুন পণ্য এবং পরিষেবা বিকাশের জন্য সামুদ্রিক পরিবেশ থেকে জৈবিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ।

নীল অর্থনীতির সুবিধা ঃ নীল অর্থনীতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ—

১। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic growth) ঃ** নীল অর্থনীতিতে সারা বিশ্বের দেশগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

২। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Job creation) ঃ** নীল অর্থনীতি মৎস্য, পর্যটন, সামুদ্রিক শিপিং এবং অফশোর শক্তিসহ বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে।

৩। **উন্নত জীবিকা (Improved livelihoods) ঃ** নীল অর্থনীতি উপকূলীয় সম্প্রদায়ের বসবাসকারী লোকদের জীবনযাত্রার উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে।

৪। **মহাসাগরের ভৌত অবস্থা (Ocean health) ঃ** নীল অর্থনীতি এমনভাবে পরিচালিত হতে পারে, যা সমুদ্রের ভৌত অবস্থা রক্ষা করে।

নীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ঃ নীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ—

১। **পরিবেশের অবক্ষয় (Environmental degradation) ঃ** টেকসইভাবে ব্যবস্থাপনা না করা হলে নীল অর্থনীতি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

২। **অতিরিক্ত মাছ ধরা (Overfishing) ঃ** অতিরিক্ত মাছ ধরা একটি বড় সমস্যা, যা নীল অর্থনীতির স্থায়িত্বকে হুমকির সম্মুখীন করছে।

৩। **জলবায়ু পরিবর্তন (Climate change) ঃ** জলবায়ু পরিবর্তন নীল অর্থনীতির জন্য একটি বড় হুমকি। কারণ এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, যা উপকূলীয় সম্প্রদায় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করছে। নীল অর্থনীতি একটি জটিল ও দ্রুত বিকাশমান খাত। নীল অর্থনীতি টেকসইভাবে পরিচালিত হয় এবং এটি সারাবিশ্বের দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশে নীল অর্থনীতির প্রধান সম্ভাবনা★

১. মৎস্য ও মৎস্যচাষ
২. পর্যটন
৩. সামুদ্রিক শিপিং
৪. অফশোর এনার্জি
৫. উপকূলীয় সুরক্ষা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★নীল অর্থনীতির উপাদান★

১. ফিশারিজ ও অ্যাকুয়াকালচার
২. সামুদ্রিক পরিবহন ও শিপিং
৩. পর্যটন ও বিনোদন
৪. সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি
৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশে ব্লু ইকোনমি প্রচার নীতি★

১. সামুদ্রিক মৎস্যচাষে বিনিয়োগ
২. অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ
৩. সামুদ্রিক পর্যটন প্রচার
৪. সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা
৫. নীতির বাস্তবায়ন

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

অধ্যায়-১৪
ডেল্টা প্ল্যান

এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহঃ

১. ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২. বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনা

৩. বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যানের বিভিন্ন হটস্পট জোন

৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প

৫. বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের সুবিধা

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য★

ডেল্টা প্ল্যান-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(ক) খাদ্য নিরাপত্তা (Food security)

(খ) পানি নিরাপত্তা (Water security)

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development)।

এ তিনটি ভাগ দ্বারা ডেল্টা প্ল্যান-এর ৬টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়–

(i) সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(ii) পানি পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন।

(iii) সমন্বিত ও টেকসই নদী এবং নদী মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

(iv) জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(v) আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন করে তোলা।

(vi) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বিডিপি 2100-এর চারটি অত্যধিক লক্ষ্য রয়েছে; যথা–

(ক) একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা।

(খ) ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা।

(গ) টেকসই পদ্ধতিতে বদ্বীপ পরিচালনা করা।

(ঘ) জলবায়ু সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তোলা।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনা★

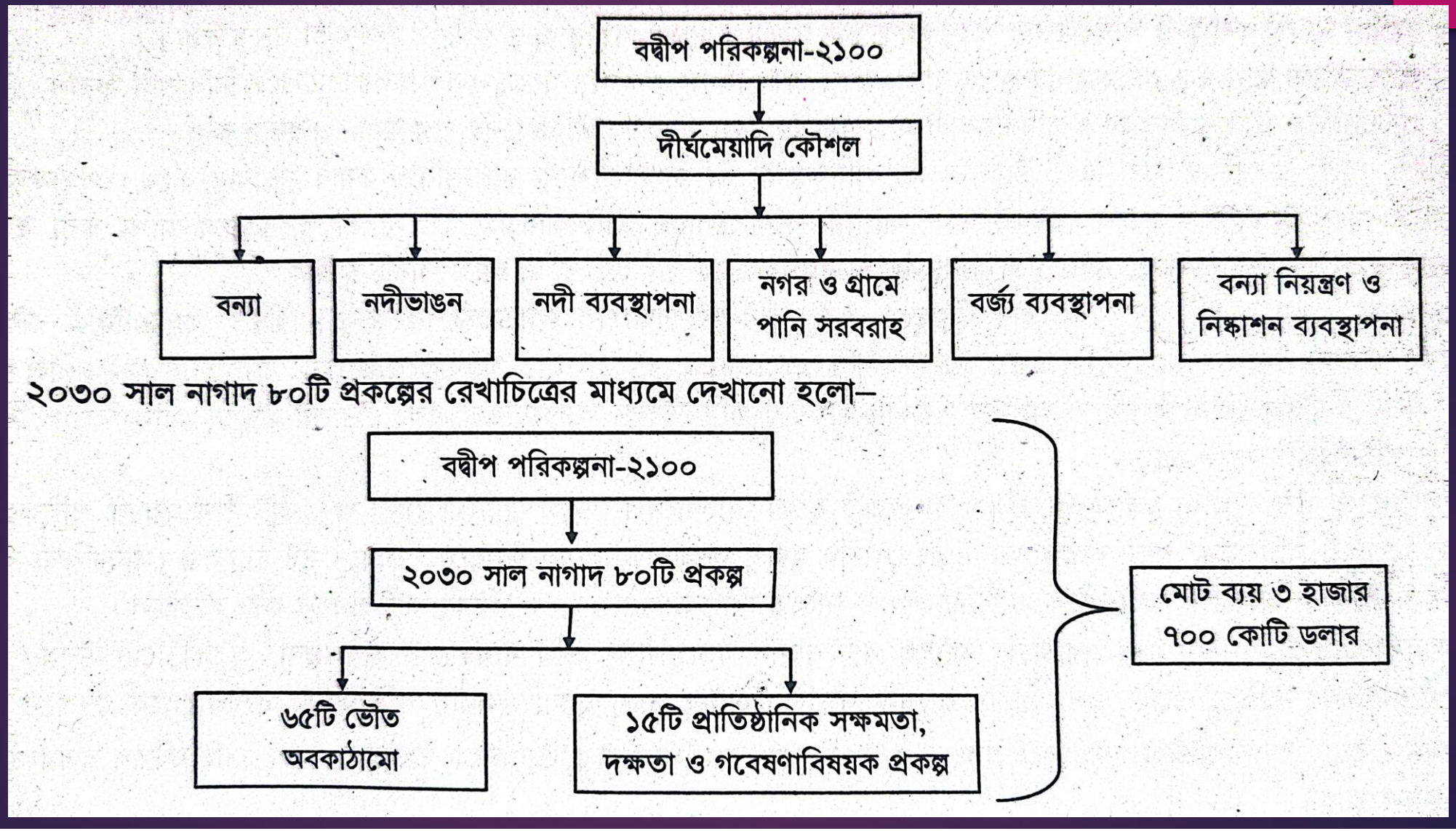

২০৩০ সাল নাগাদ ৮০টি প্রকল্পের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যানের বিভিন্ন হটস্পট জোন★

বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা 2100-তে সমগ্র দেশকে মোট ৬টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে। হটস্পটগুলো হচ্ছে—

(ক) উপকূলীয় অঞ্চল

(খ) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল

(গ) হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

(ঙ) নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং

(চ) নগরাঞ্চল।

হটস্পট	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম
উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা এবং শরীয়তপুর।
বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল	১৮	বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, পাবনা, পঞ্চগড়, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ এবং ঠাকুরগাঁও।
হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ এবং সিলেট।
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটি।
নদী এবং মোহনা অঞ্চল	২৯	বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ফেনী, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পাবনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং খুলনা।
নগরাঞ্চল	৭	বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এবং সিলেট।
অপেক্ষাকৃত কম দুর্যোগপ্রবণ এলাকা	৬	গাজীপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী এবং শেরপুর।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প★

১। **বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 (Bangladesh delta plan 2100) ঃ** এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বদ্বীপ অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চালু করা একটি ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এটি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, অবকাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং নগর উন্নয়নের মতো বিভিন্ন খাতকে কভার করে।

২। **উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (Coastal Embankment Improvement Project–CEIP) ঃ** CEIP হলো একটি বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য জলোচ্ছ্বাস এবং ঝড়ের প্রকোপ থেকে সম্প্রদায় এবং কৃষিজমিগুলোকে রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় বাঁধকে শক্তিশালী করা। প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যমান বাঁধের পুনর্বাসন ও উন্নতির পাশাপাশি নতুন বাঁধ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩। **সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (Sundarbans biodiversity conservation project) ঃ** সুন্দরবন একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, বদ্বীপ অঞ্চলের একটি অনন্য ম্যানগ্রোভ বন বাস্তুতন্ত্র। এ প্রকল্পটি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ইকোটুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৪। **দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমন্বিত জলসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Southwest area integrated water resources planning and management project) ঃ** এ উদ্যোগের লক্ষ্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। এতে বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা এবং নিষ্কাশন চ্যানেলসহ পানির অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন জড়িত।

৫। **উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্প (Coastal and marine fisheries project) ঃ** এ প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য খাতের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এটি মাছ ধরার প্রযুক্তি বাড়ানো, টেকসই জলজ প্রাণী চাষ অনুশীলনের প্রচার এবং মাছ ধরা সম্প্রদায়ের জীবিকা উন্নত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৬। **জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন এবং পুনঃবনায়ন প্রকল্প (Climate resilient participatory afforestation and reforestation project) ঃ** এ প্রকল্পটি বনায়ন এবং পুনরুদ্ধার প্রচারের মাধ্যমে বদ্বীপ অঞ্চলের দুর্বল সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটির লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা, মাটির ক্ষয় কমানো এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

৭। **বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড (Bangladesh delta fund) ঃ** নির্দিষ্ট প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড নামে পরিচিত একটি নিবেদিত অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এ তহবিলটি বিভিন্ন প্রকল্পকে সমর্থন করে, যা ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্যগুলোর সাথে সারিবদ্ধ এবং বদ্বীপ অঞ্চলে সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের সুবিধা★

বাংলাদেশে যদি একটি ডেল্টা প্ল্যান প্রজেক্ট থাকে, তাহলে এর সুবিধাগুলো সম্ভাব্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে–

১। জলবায়ু সহনশীলতা (Climate resilience) ঃ বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। একটি ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন– বন্যা সুরক্ষা অবকাঠামো তৈরি করা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং টেকসই ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২। পানি ব্যবস্থাপনা (Water management) ঃ বাংলাদেশের মতো একটি বিস্তৃত নদী বদ্বীপের দেশের জন্য কার্যকরভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পে কৃষি, শিল্প, সুপেয় এবং পানীয়ের উদ্দেশ্যে পানির নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করা জড়িত থাকতে পারে।

৩। কৃষি উন্নয়ন (Agricultural development) ঃ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে।

৪। পরিবহন এবং সংযোগ (Transportation and connectivity) ঃ একটি সুপরিকল্পিত ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প বদ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর সাথে পরিবহন ও সংযোগের উন্নতিকে ফোকাস করতে পারে। উন্নত রাস্তা, সেতু এবং পরিবহন অবকাঠামো, বাণিজ্য, পর্যটন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়াতে পারে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

★বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের সুবিধা★

৫। নগর উন্নয়ন (Urban development) ঃ ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলো দ্রুত নগরায়ণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একটি ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প দক্ষ নগর পরিকল্পনা, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বাসিন্দাদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রাসহ টেকসই নগর উন্নয়ন কৌশলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৬। পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental conservation) ঃ বাংলাদেশের নদী বদ্বীপ জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রে সমৃদ্ধ। একটি ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প এ মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে জোর দিতে পারে।

৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic growth) ঃ জটিল উন্নয়ন সমস্যা মোকাবিলা করে এবং দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে, কাজের সুযোগ তৈরি করতে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে।

৮। শক্তি উৎপাদন (Energy production) ঃ বদ্বীপ অঞ্চলে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পের সম্ভাবনা থাকতে পারে, যেমন– জলবিদ্যুৎ বা জোয়ার শক্তি। ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্প দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে এ সম্পদগুলো অন্বেষণ এবং ব্যবহার করতে পারে।

৯। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster risk reduction) ঃ আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সংবেদনশীল। ডেল্টা প্ল্যান প্রজেক্ট সম্প্রদায়ের উপর এ ধরনের ইভেন্টের প্রভাব কমানোর জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং উচ্ছেদ পরিকল্পনাসহ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial

Compiled By: Mr. Ratnajit Pial